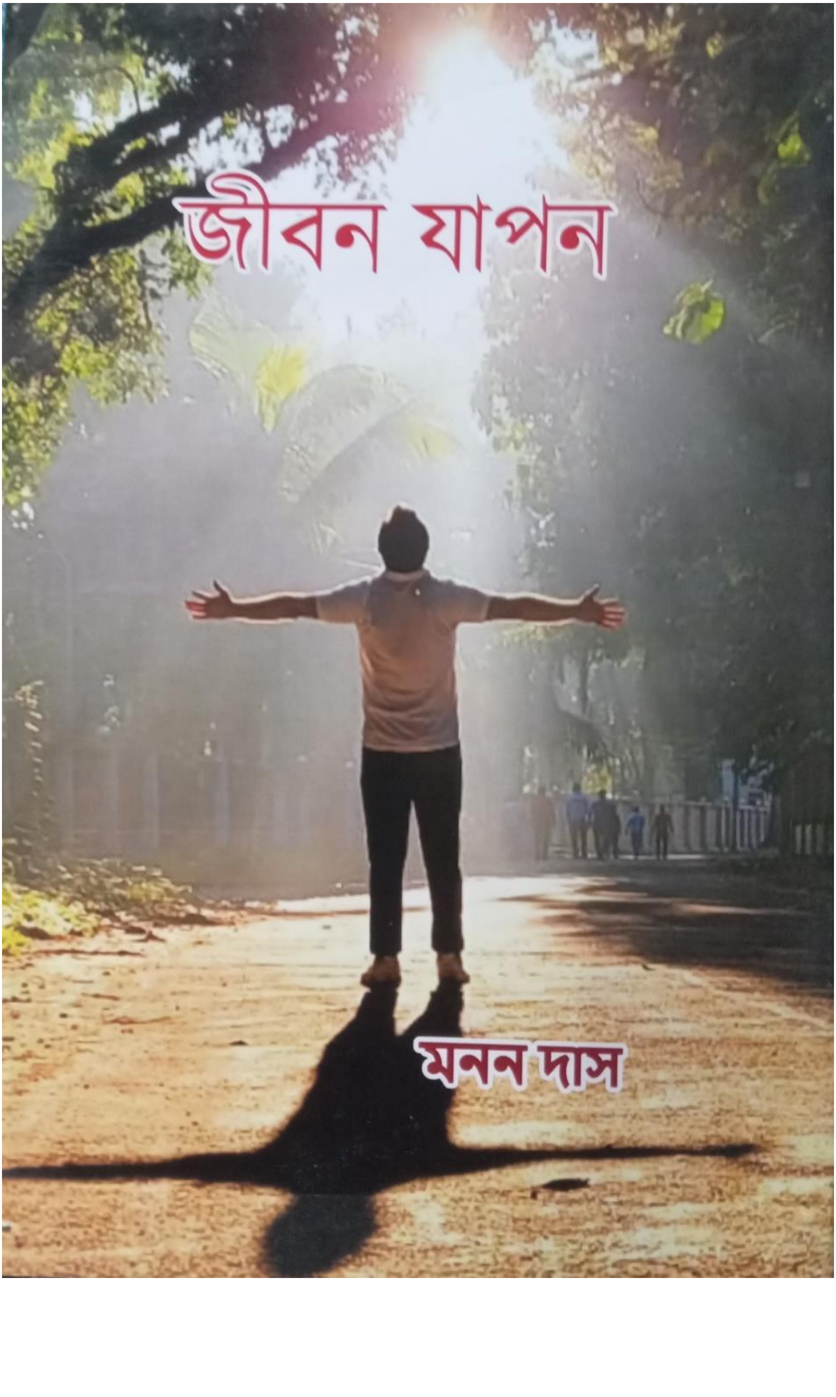


জীবন যাপন
মনন দাস

জীবন যাপন

মনন দাস

সৌরভ
গ্রন্থ্ প্রকাশনী
বালী হাওড়া

Jiban japan

A Collection of short stories

By Manan Das

প্রকাশকঃ
বউল পাঁজা
৫৭/২, গঙ্গাকান্ত ভাদুড়ী স্ট্রীট,
বালী, হাওড়া, ৭১১২০১

মুদ্রকঃ বউল পাঁজা

প্রচ্ছদঃ ফটিক দাস

প্রথম প্রকাশ - দীপাবলী ১৪৩১
মূল্যঃ দেড়শ টাকা

উৎসর্গ

প্রিয় বন্ধু প্রবীর সাহা কে

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ

উপন্যাসঃ

মনভূমি
মন এক উষ্ণ প্রস্রবণ
ঝলমলি
ছুট
গোবু গোবিন্দ

গল্প সংগ্রহঃ

অন্য স্বাদ
পঞ্চস্বর
গল্প পঞ্চক
জীবন যাপন

কিশোর উপন্যাসঃ

রাজু নারাণের কীর্তি

ছড়ায় গল্পঃ

আটটা ঠাট্টা

কবিতাঃ

বন সবুজের মন (কবিতা সংগ্রহ, ১ম পর্ব)
স্থাবর অস্থাবর (কবিতা সংগ্রহ, ২য় পর্ব)

সূচীপত্র

জীবন যাপন

বিকাল না হতেই কার অদৃশ্য হাত গুটিয়ে নেয় রোদের আস্তরণ, শুধু গীর্জার তীক্ষ্ণ চূড়ায় অনেকক্ষণ আটকে থাকে একটু ছেঁড়া টুকরো। এসময় আমি ওদিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে দেখি, পুনরায় টেবিলে ঝুঁকে দ্রুত শেষ করে নিতে চাই কাজ। টেবিলে বসে আমার অফিসের খোলা জানালা দিয়ে শুধু গীর্জার চূড়ার অংশ আর তার পিছনে একটুকরো আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায়না। তিন তলার ওই জানালাটা আমার টেবিল থেকে বেশ দূরে। অবশ্য উঠে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালে কয়েকটি বাড়ি, পার্কের কিছুটা অংশ, ট্রামলাইন, রাস্তা ও মানুষজন সবই দেখা যায়।

কখনো কখনো আমি এতগুলো টেবিল পেরিয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়াই। আমার এই অভ্যাসকে অবশ্য অনেকে অন্য কিছু ভাবে, ভাবে হয়ত আমি বিশেষ কাউকে দেখার জন্য বা ইংগিতে কথা বলার জন্য ওখানে গিয়ে দাঁড়াই, কিন্তু তা নয়, আসলে আমার কেমন ঘোর ঘোর লাগে, কিরকম অস্বস্তি -

এক এক সময় টেবিলে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ মাথা তুলে জানালার দিকে তাকালে আমার এরকম মনে হয় - আমি যেন কোনো জাহাজের কেবিনে বসে আছি, জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মাস্তুলের চূড়া ও আকাশ, এখনি জানালায় গিয়ে দাঁড়লে দেখতে পাবো উত্তুঙ্গ নীল জলরাশি, অসীম জলরাশি পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে জাহাজ সীমানার সন্ধানে। আকাশের ওই টুকরোয় উড়ন্ত কোনো পাখিকে মনে হয় এলবাট্রস - এখনই বসবে মাস্তুলের শীর্ষে - ভাবতে ভাবতে আমার কেমন ঘোর ঘোর লাগে, আমি জানালায় গিয়ে দাঁড়াই।

এরকম অদ্ভুত চিন্তাবলীর জন্য আমি নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত। এসব নিজের মধ্যেই গোপন করে রাখি। কাউকে কিছু বলি না, এমনকি অনুরাধাকেও নয়।

সেদিন আলিপুরে ফুলের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে একটা গোলাপ গাছের কাছে যখন আমরা দাঁড়িয়েছিলাম হঠাৎ দেখলাম একটা পিঁপড়ে একটা গোলাপের পাপড়ির ওপর দিয়ে গুটিগুটি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল কেন্দ্রের কাছে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। সহসা আমার মনে হলো আমি ওই পিঁপড়েতে রূপান্তরিত হয়ে প্রবেশ করছি ফুলের গভীরে যেখানে সুগন্ধের উৎস ও মধুর ভান্ডার। আমার মুখমন্ডলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফুলের রেণুর মাখামাখি, শরীরে কোমল পাপড়ির স্পর্শ।

আমি কেঁপে উঠলাম, অনুরাধা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল - কি হলো?

যদিও শীতের দিন তবুও দুপুর এবং রোদ, কিন্তু আমি বললাম – হঠাৎ কেমন শীত লাগল।

- সোয়েটারটা গায়ে দিয়ে নাও - অনুরাধা বলল।অনুরাধা এভাবেই কথাবার্তা বলে। অনেকদিন ঘর সংসার করা পাকা গৃহিনীর মতো। আমাকে অনেক সময় উপদেশ দেয়। সময়ের হিসাবে অবশ্যই আমাদের সম্পর্ক তেমনই স্বাভাবিক। কারন আমাদের প্রেমপর্ব অনেকগুলি বৎসর অতিক্রম করে এসেছে। অনুরাধা সেভাবেই সহজ সরল এবং অকপট। আমি অনুভব করতে পারি আমার কাছে গোপন করার মতো তার কোনো কথা নেই।

কিন্তু আমি? আমার গোপনীয়তা? এই যে অসুখ আমি আমার মধ্যে গোপন করে চলেছি যা আমাকে পর্যুদস্ত করছে, আমার চিকিৎসক যার নাগাল পাচ্ছেনা, তা আমি কেমন গোপন করে চলেছি অনুরাধার কাছে। ভাবতে গেলে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়, তবু আমি কিছুতেই বলে উঠতে পারিনা। অথচ দিনে দিনে এ আশঙ্কা আমার মধ্যে ক্রমশঃ দানা বাঁধছে যে কোনো দিন ডাক্তার আমাকে এক দুরারোগ্য ব্যাধির কথা

বলে ফেলবে।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি এক সকালে প্রথম আমি আমার অসুখের লক্ষণ অনুভব করলাম। বাথরুমে মুখ ধুতে ধুতে সহসা আমার গলার মধ্যে কেমন এক চিনচিনে ব্যথা আমাকে অস্বস্তি দিচ্ছিল, কিন্তু আমি সেটাকে বিশেষ আমল না দিয়ে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়ে গেলনা, সারা দিনে দু একবার অমনই ব্যথা। যদিও সকালের মতো অতো তীব্র নয়, তবু। আমি ওটাকে তুচ্ছ করতে চাইলাম। অবশ্য সন্ধ্যায় বা রাতে যদিও আর নয়, কিন্তু পরদিন সকালে পুণরায়, ঠিক একই ভাবে - অর্থাৎ বাথরুমে মুখ ধোওয়ার সময়।

ক্রমশঃ আমি একটা আতঙ্কের মধ্যে তলিয়ে গেলাম। দিনের অন্যান্য সময়তো বটেই, বিশেষতঃ সকালে রোজ ঘুম থেকে উঠেই আমি আতঙ্কগ্রস্ত, এবং বাথরুমে ঢুকে মুখে জল দেওয়া পর্যন্ত আমার যেন ধারাল ক্ষুরের ওপর পা - কতক্ষণে ব্যথা সাড়া দেবে - এভাবেই আমি দিনে দিনে ক্রমশঃ ভঙ্গুর। ব্যাথার স্থায়িত্ব বেশির ভাগ সময়ই কয়েক সেকেন্ড বা বড় জোর এক মিনিট। কখনো কখনো অবশ্য দু তিন মিনিট ও থাকে। ব্যথার সম্পর্কে আমি সারাক্ষণ সজাগ, তার খুঁটিনাটি, তার হিসাব নিকাশ - এভাবে পর্যুদস্ত আমি অবশেষে একদিন ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম।

ডাক্তারবাবু আমাকে হাঁ করিয়ে টর্চ জ্বেলে তীক্ষ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন, কব্জি ধরে দেখলেন, বুকে পিঠে কল বসিয়ে কিছু শুনলেন, তারপর বললেন - গলাটা একটু বেশি লাল দেখাচ্ছে, ও কিছু নয়, শ্লেষ্মার ব্যথা। অষুধ লিখে ফেললেন, বললেন - নতুন ঠান্ডা পড়ছে তো, এসময় একটু সাবধানে থাকবেন।

কতগুলি ট্যাবলেট ক্যাপসুল এবং চামচ মেপে তরল ওষুধ আমি নিয়মিত খেয়ে চললাম, কিন্তু এক সপ্তাহ ধরেও কোনো পরিবর্তন ঘটল না।

অতঃপর পুণরায় ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারবাবুর গম্ভীর পর্যবেক্ষণ এবং ওষুধ পরিবর্তন। পরিবর্তিত ওষুধ আবারও সপ্তাহখানেক - কিন্তু কোনো কম হলোনা। আমি অস্থির হয়ে পড়লাম, বললাম ডাক্তরবাবু, আমার সর্দি নেই, জ্বর নেই, শ্লেষ্মা নেই, অথচ ব্যথা, আপনি ভাল করে দেখুন।

ডাক্তারবাবু ভাল করে দেখলেন, আবার ওষুধ পাল্টালেন, কিন্তু আমার অসহায় অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলোনা, ওষুধ কোনো কাজ করলনা।

এবার ডাক্তারবাবু বললেন - আপনি কি খুব বেশি সিগারেট খান? - ওনাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল, আমার না-সূচক ঘাড় নাড়া বোধহয় ডাক্তারবাবু দেখতে পেলেন না, চিন্তিতভাবে বললেন - সিগারেট না খাওয়াই ভাল। আমি কোনো উত্তর না দিয়ে নতুন প্রেসক্রিপশন হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।

আমি সিগারেট খাই না। আসলে যে বয়সে ছেলেরা সিগারেট খাওয়া শুরু করে সে বয়সে ওটা আমি ধরতে পারিনি। পরবর্তীকালে পূর্ণ যৌবনে ওটা আর ধরা হয়ে ওঠেনি। আসলে আমার মনে হয়েছে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেরা সিগারেট ধরে সম্ভবত নিজেকে যথেষ্ট বয়স্ক প্রতিপন্ন করার জন্য বা নায়কোচিত ভাবভঙ্গি, নিজেকে স্মার্ট দেখানোর জন্য, সেজন্যই ছেলেরা উঠতি বয়সে সিগারেট ধরে।

কিন্তু আমার মধ্যে ও ধরনের চিন্তাধারা জাগতে জাগতেও অর্ন্তমুখী। কেমন এক শঙ্কা আমাকে পিছনে টানত, মনে হতো অমনটি আমি কিছুতেই পারবোনা। তাছাড়া সিগারেট ধরার ব্যাপারে আমার আরও অনিচ্ছা আমার গানের জন্য, আমার মনে হতো সিগারেট খেলে গলা নষ্ট হয়ে যাবে।

নায়কোচিত গুণাগুণ ও চাকচিক্য না থাকা সত্বেও আমার জীবনে প্রেম এলো, অনুরাধা আমার জীবনে এলো ওই গানের পথ ধরে। আমার স্মার্ট বন্ধুরা যা চেয়ে পায়নি আমি না চেয়ে তা পেলাম। এ আমার আশাতীত

সৌভাগ্য। আমি ভাবতেও পারিনি। নাকি - হ্যাঁ হয়তো ভেবেছিলাম সংগোপনে, সে ভাবনা ছিল আমার মনের এতই অতলে যে আমি নিজেও তা টের পাইনি। যখন জানলাম সে কি বিস্ময় আর আনন্দ!

গান আমার জীবনে সেই বাল্যকাল থেকেই জড়িয়ে আছে মনের পরতে পরতে। মায়ের গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান সেই ভাষা না বোঝার বয়স থেকেই আমার সঙ্গী। কবিগুরুর গানকে আমি ভালবেসেছি মায়ের সঙ্গে মায়েরই মতো। তারপর কবে যেন মায়ের কাছে শেখার শুরু।

অনুরাধার দাদা সরোজ একদিন আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। ওর মায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেছিল - মা, এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম, ও খুব ভাল রবীন্দ্রসংগীত গায়। ' খুব ভাল ' - শুনে আমি লজ্জায় জড়োসড়ো। সরোজ যে কি বলে! সেই প্রথম আমি ওনাকে গান শুনিয়েছিলাম, সেই প্রথম আমি অনুরাধাকেও গান শুনিয়েছিলাম।

ইদানিং আমি আর গান গাই না। ডাক্তারের নিষেধ নয়, ডাক্তারবাবু জানেনেই না আমি গান গাই, আমি নিজেই বন্ধ করে দিয়েছি। ভয় হয়, গলার ওপর চাপ পড়তে পারে, শিরাটিরা ছিঁড়ে যেতে পারে, অসুখ বাড়তে পারে। গান গাইতে না পারায় আমার কি যে কষ্ট! কি জানি, এ জীবনে আর গান গাওয়া হবে কি না। জানিনা এ পৃথিবীতে আমার আয়ু -

পুরানো দিনের কথা আজ আমাকে বড় বেশি নাড়া দিচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির সুখময় স্মৃতি আমাকে ঠেলে দিচ্ছে গভীর বিষন্নতায়। দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না –

এ পৃথিবীতে আমি যদি না থাকি তাহলেপৃথিবী থাকুক বা না থাকুক তাতে কি আসে যায়? কিন্তু সব মানুষকেই তো একদিন চলে যেতে হবে - একথা জেনেও মানুষ গুছিয়ে তোলে সম্পদ। নিজে যত না ভোগ করে তার চেয়েও বেশি করে সঞ্চয়... মানুষের এ সঞ্চয় ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারদের জন্য। সম্ভবত এ ভাবনা মনের গভীরে কাজ করে - আমি থাকবোনা কিন্তু আমার

চিহ্ন থাকবে আমার সন্তান সন্ততির মধ্যে, আমার বংশধারায়....

অনুরাধা বড় বেশি গোছালো। ভবিষ্যৎ খুঁটিনাটি সম্পর্কে তার চিন্তা অনেক দূর অবধি প্রসারিত। এমনকি সে ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েকে কি ভাবে মানুষ করবে সে সম্পর্কেও চিন্তা করে। নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে আলোচনা করে। এব্যাপারে আমার অন্যমনস্কতায় সে অবাক হয়, আমাকে ধমক দেয়।

গোছালো অনুরাধা এভাবেই আমাকে বাসস্থান সম্পর্কে সচেতন করেছিল,বলেছিল এভাবে চিরকাল ভাড়া বাড়িতে থাকলে চলবে? আমার ইচ্ছা বিয়ে করে আমি নিজের বাড়িতে গিয়ে উঠি। শুনে আমি খুব হেসেছিলাম, বলেছিলাম তাহলে তোমাকে অনন্তকাল অপেক্ষা করে কাটাতে হবে, নয়ত আমাকে ছেড়ে -

এত পর্যন্ত বলে আমি অসহায় চুপ। ছাড়াছাড়ির ঠাট্টা ইয়ার্কিটুকুও অনুরাধা সহ্য করে না। তাই আমি চুপ করে গেলে কি হবে, যতটুকু কথা মারাত্মক ততটুকু তো বেরিয়েই গেছে, অতএব সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুরাধার সুযম সুন্দর চরণযুগলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেই অনুরাধা - ওরে দুষ্টু পাজি - বলে আমার পিঠে এক কিল।

....কিভাবে এসব অর্থহীন হয়ে যায়...

জলরেখা যেমন মিশিয়ে যায় জলে - চিহ্নও রাখেনা, সেভাবেই আমি মুছে যাবো...

গ্রাম থেকে আজ সেই লোকটি এসেছিল। অফিসে আমার সামনের চেয়ারে বসিয়ে আমি এত কথা ভেবে ফেললাম। আজকাল কথার চেয়ে আমার ভাবনা অনেক বেশি। এমনকি কারও সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও আমি কথার সূত্র ধরে ভাবনার গভীরে তলিয়ে যাই। লোকটি যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল ওকে দেখেই আমি ভাবনার গভীরে। অথচ ওকে একটা কিছু পাকাপাকি কথা বলা দরকার। ও এলো এ নিয়ে তিনবার। সেই দূর গ্রাম

থেকে আসতে ওকে অনেক সময় নষ্ট করতে হয়েছে।

- কি যেন আমাদের গ্রামের নাম? -

- রতনপুর -

হ্যাঁ হ্যাঁ, রতনপুর, রতনপুর আমি কখনও যাইনি। সত্যি কথা বলতে কি ওটা যে আমাদের পূর্বপুরুষের গ্রাম, বাবা তাঁর কৈশোর যে গ্রামে কাটিয়েছেন সে গ্রাম সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। ও গ্রামের সম্পর্কে আমি প্রথম শুনলাম মা যেদিন তাঁর বাক্স ঘেঁটে একটা পুরোনো দলিল বার করে আমাকে দিলেন।

তিন কামরার ছোট যে একতলা বাড়িটায় আমরা ভাড়া থাকি সে বাড়িটা এ শহরের পুরোনো বনেদী অঞ্চলে ঘনবসতি এলাকায় অবস্থিত। চারপাশে দুই তিন তলা বাড়ির মাঝে যদিও বাড়িটির অবস্থা কোনঠাসা তবু কম ভাড়ায় আর দীর্ঘদিনের বাস - এভাবে নতুন কিছু চিন্তা কখনই আমাদের মনে আসেনি। তাই অনুরাধা যখন আমাকে নিজেদের বাড়ি সম্পর্কে সচেতন করছিল তখন ওটা অর্থহীন বকবকানি বলে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম, ঠিক তখন কি অদ্ভুত ব্যাপার একদিন বাড়িওয়ালা বললেন বাড়িটা আমি বিক্রি করে দোবো ভাবছি।

প্রতি মাসের মতো এ মাসেও আমি ভাড়া দিতে গিয়েছিলাম। পাশের দোতলা বাড়িটায় উনি থাকেন।বাবার সঙ্গে ওনার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমাকে বললেন - কি বলব, তুমি আমার ছেলের মতো, এই সামান্য ভাড়ার টাকায় এখন আর কিছুই হয় না।

- কিন্তু আমি তো ভাড়া কিছু বাড়াতে পারি, আপনি আগে আগে যখনই বলেছেন আমরা ভাড়া বাড়িয়েছি।

- আমি তা বলছি না, তুমি ভুল বুঝোনা, আমি বলতে চাইছি ভাড়ার ওই টাকায় আজকাল আর কিছুই হয় না, বাড়িটা বিক্রি করে একসঙ্গে বেশ কিছু

টাকা পেলে কিছু একটা করা যাবে। আমার ছোট ছেলে, সন্তু, দেখোনা, চাকরি বাকরি কিছু হলনা। ওর জন্য কিছু একটা করা দরকার। তা তুমিই না হয় এটা কিনে নাওনা। চেষ্টা করে দেখো। তোমরা কিনলে আর কোনো ঝামেলা হয়না। কিন্তু তা না হলে তোমাদের বাড়ি খালি করে দিতে হবে। আজকাল কোনো ভাড়াটে বাড়ি ছাড়তে চায়না। আশা করি তুমি তা করবেনা। শুনেছি তোমার ঠাকুর্দা শহরে এসে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাচ্ছিলেন না, আমার বাবা তাঁর পরম বন্ধু, তাঁর, থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তোমাকে আমি নয় কিছু কম করে দেবো। বাড়িটায় দোতলার ভিত আছে, ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে দোতলায় ঘর করতে পারবে।

.... হায়রে! দোতলা.... এ পৃথিবীতে আমি আর কতদিন! ডাক্তার বাবু বলে দিলেই হলো - আর মাত্র ছমাস বা এক বছর...

- চুপ করে থেকোনা, ভেবে দেখ।

...সমুদ্রের বুকে নীল আকাশে ওড়ে এলবাট্রস...মুক্ত আকাশ...মুক্ত বাতাস...ওর ডানায় ভর করে আমি হারিয়ে যাবো...

কেন যে এমন দিবাস্বপ্ন হানা দিয়ে যায়!

তবু এগিয়ে যেতে হবে। অসম্ভবকে সম্ভব করতে সবাই উঠে পড়ে লেগে গেলাম। আমার কবছর মাত্র চাকরির প্রভিডেন্ট ফান্ডের ধার, অফিসের কোঅপারেটিভের ধার, মা বললেন গয়না বিক্রি করব, এমনকি ছোট ভাই - যে সবেমাত্র এল. এম. ই. পাশ করে শিক্ষানবিশ, সে ও বলল - আমি হাজার দুয়েক টাকা ধার করতে পারি। অনুরাধার এ কথা শুনে কি উত্তেজনা! - আমি আর কি পারি - উত্তেজনা থেকে সে ক্রমশঃ বিষাদে - আমি তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দোবো, নিতে হবে কিন্তু!

... মানুষ কিভাবে কষ্ট করেও জমিয়ে তোলে সম্পদ...কেন? তারপর সব ফেলে চলে যেতে হয়...

অনুরাধা বলে - দ্যাখো বিয়ে করে তুমি জড়িয়ে পড়ো এ আমি চাইনা। আমি বলি - এম. এ. পাশ কি তুমি বিয়ের পর করতে পারবেনা?
- পারব না তো! অধিকাংশ মেয়েই দেখবে বিয়ের পর সব কিছু চুকিয়ে বুকিয়ে দেয়। গান বাজনা লেখাপড়া শিল্প সংস্কৃতি - সব কিছু। যেন বিয়ের আগে ওসব চর্চা শুধু বিয়ে ব্যাপারটা ওৎরানোর জন্য। কিন্তু আমি তা চাইনা। আমি চাই বিয়ের পর তোমার পাশে দাঁড়াতে। তোমার দায় দায়ীত্ব যেন আমার দায় দায়ীত্ব হয়।

বাড়ি কেনার কথায় অনুরাধার কল্পনা আরও সুদূর প্রসারী - ওপরে ঘর তোলা হবে, দোতলার ঘর হবে শোবার ঘর। আমি উদাসীন চোখে তাকিয়ে ওর দিকে, কোনো উত্তর দিতে পারিনা। - কি হলো? - ঠেলা দিয়ে বলে ও, আমি বলি কিছুনা।

কিন্তু টাকা আর পূর্ণ হয়না। তখন মা একদিন বললেন - আমাদের গ্রামের ভিটের কথা শুনেছি পোড়ো হয়ে পড়ে আছে, ওটা বিক্রি করা যায়না? গ্রামের ভিটে মা কখনো দেখেননি। ঠাকুর্দা জীবিকার সন্ধানে শহরে এসেছিলেন, আর ফেরা হয়নি। আমার বাবা সাধারণ আয়ের মানুষ, সংসার চালিয়ে আর ছেলে মেয়ে মানুষ করে শেষ পর্যন্ত মেয়ের বিয়েটুকু দিতে পেরেছিলেন, তারপর চোখ বুজেছেন। বুঝতে পারি গ্রামের ঘরদোর সারিয়ে তালাবন্ধ ফেলে রেখে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া - এ বিলাসিতা বাবা চিন্তা করেননি।

মা তাঁর তোরঙ্গ ঘেঁটে খুঁজেপেতে একটা দলিল বার করলেন। দলিল হাতে নিয়ে আমি উদাসীন হাসি হাসলাম। মা বললেন - কি হলো?
- কিছু না - আমি বললাম।

কোথায় যে গ্রামের অবস্থান দলিল পড়ে কিছুই বুঝলাম না। কিভাবে যাওয়া যাবে? দলিল পড়ে দেখলাম সম্পত্তি ভাগের দলিল। ওতে ঠাকুর্দার অন্য ভাইদের নামও ছিল, আমি তাঁদের সর্ব কনিষ্ঠ জনের নামে একটা চিটি

লিখলাম। পোড়ো বাড়ি আছে কি না দখল হয়ে গেছে কে জানে! কি অবস্থায় আছে জানতে চাইলাম, লিখলাম আমরা ওটা বিক্রি করে দিতে চাই। আমার অফিসের ঠিকানা দিলাম।

চিঠির উত্তর নয়, একদিন সশরীরে অফিসে হাজির হলো একজন মধ্যবয়সী লোক, জানা গেল ছোট ঠাকুর্দা - যাঁকে আমি চিঠি লিখেছিলাম তিনি বেঁচে আছেন, তবে অথর্ব, তিনি ওনাকে গাড়িভাড়া দিয়ে পাঠিয়েছেন। - বাড়িঘর বলতে একটা ঢিবি, তাও জঙ্গলে ঢাকা পড়ে আছে - তবে জমি অনেকটা, সেটা বিক্রি করা যাবে, আমি এসব কাজই করি, তাই আমাকে উনি পাঠিয়েছেন। আমাকে কিছু দেবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দোবো।

আজ এসে জানাল খরিদ্দার জোগাড় হয়েছে, আমাকে গিয়ে কথা বলতে হবে।

শীতের সন্ধ্যায় বাতাস ও ধোঁয়া মিলেমিশে থমকে আছে চারিদিকে। যানবাহন মানুষজন কোনও কিছুই পরিষ্কার দৃশ্যমান নয়। এ পথে হাঁটতে বুকের মধ্যে বিষন্নতা যেন পাহাড় প্রমান। তবু কাজ করে যেতে হবে। রক্ত ও দলিল - দুটো কাজ নিয়ে বেরিয়েছি। রক্তের নমুনা দিয়ে আমি চৌরাস্তার দিকে - ওখান একটা দোকানে জেরক্স কথাটা লেখা আছে, দলিলটা একটা কপি করতে দিয়ে আমি ফুটপাথে দাঁড়ালাম। বিশ্রী শব্দ করতে করতে পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ির সার - বাস লরি প্রাইভেট - যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। এখনও বাসে গাদাগাদি ভিড়। কোথায় যায় এত মানুষ? শেষ পর্যন্ত সবাই তো চলে যায় শূণ্যের দিকে। এই যে পুরোনো দলিল এতে অস্তিত্ব বলতে আছে শুধু কয়েকটি নাম, কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মাত্র। আমার ঠাকুর্দার নাম যদি মহেন্দ্র না হয়ে খগেন্দ্র হতো? কিংবা খ বা গ যদি নাম রাখা যায়? কিছুদিন পর আমিও শুধুমাত্র কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টি মাত্র একটি নাম হয়ে যাব। আমি চলে যাব কোন শূন্যতার দিকে। তবু রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন।

মৃত্যুর আগে জেনে নিতে হবে মৃত্যুর কারণ। তারপর শুধু একটা নাম। নামমাত্র কথাটার অর্থ বলতে এতদিন আমার ধারনায় ছিল - সামান্য কিছু, কিন্তু এখন -

ওই - ওই আবার গলার মধ্যে জানান দিল মৃত্যুর পদক্ষেপ...দলিলের জেরক্স কপি হয়ে গেছে...অথচ আমার পৃথিবী ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে....তবু আমি পায়ে পায়ে হেঁটে যাই...এখনও হেঁটে যাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্যহীন...

অনুরাধা, আমি আর এ পৃথিবীর কেউ নই। যদিও আপাততঃ আমি আছি অবয়বে এখানে তবু আমার আত্মা ক্রমশঃ অন্য জগৎমুখি। কোন সে জগৎ আমি জানিনা, কিন্তু -

অথবা এক পা দুয়ারে এক পা ঘরে এভাবে কি দাঁড়িয়ে আছি আমি? তোমার আকর্ষণ তোমার মোহ তোমার প্রতি ভালবাসা কিভাবে ক্রমশঃ অর্থহীন। তোমাকে যদি বলতে পারতাম! তুমি যদি ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে পারতে!

আচ্ছা, এওতো হতে পারে আমার অসুখের কথা জানা মাত্র তুমি শঙ্কিত হবে, নিজেকে সরিয়ে নেবে? আমি এরকমই বা ভাবছি কেন যে তুমি অস্থির হবে, ভেঙে পড়বে? কিন্তু ভালবাসা থাকলে তাইতো হওয়া উচিত। তখনই তো জানা যাবে তোমার ভালবাসার গভীরতা।

আঃ কি নিষ্ঠুর আমি! কি অনায়াসে ছোট করছি অনুরাধা তোমার ভালবাসাকে। এই যে তুমি - তোমার ধ্যান ধারণা সব কিছু উৎসর্গীকৃত আমার জন্য - অন্ততঃ এখন তুমি যা বলছ –

অনুরাধা বলছিল, দ্যাখে চাকরি আমি একটা পাবোই। তা ধরো যদি কয়েক হাজার টাকা মাসে উপায় করি - ও টাকাটার একটি পয়সাও কিন্তুতুমি খরচ করতে পারবে না। ওটা পুরো ব্যাঙ্কে ঢুকে যাবে, এভাবে

বছরে কয়েক হাজার, দোতলায় আমরা খুব শীঘ্রই ঘর তুলতে পারব, কি বলো!

শীতের দুপুরে রৌদ্র বড়ো মনোরম। মিষ্টি আদরের মতো। গাছেরা ঘাসেরা আর ওই নদী - ধীর প্রবাহিনী, নোঙর করা ওই জাহাজেরা - সব কিছু কি শান্ত রোদ পোহাচ্ছে নীল আকাশের নীচে। আমি ও অনুরাধা দুজনে রোদে গা পেতে সবুজ ঘাসের উপর। অনুরাধার কল্পনার সৌধ এবং আমি আমার ভাবনায়।

আমার অসুখ যখন প্রকাশ পাবে তখন কি অনুরাধা এভাবে কথা বলবে? এভাবে ভাববে? দু একদিন হয়তো কষ্ট পাবে তারপর ঠিক হয়ে যাবে। আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না। ওর শুভানুধ্যায়ীরা বলবেন - ভগবান বাঁচিয়েছেন অনুকে, আহা, যদি বিয়েটা হয়েই যেতো ?

কি হলো, কথা বলছনা কেন? -অনুরাধা বলল, আমি হাসতে চেষ্টা করলাম। আমার চোখের কাছে এখন ঘাসের একটি শুকনো শীষ। কি সূক্ষাতিসূক্ষ কারুকার্য করতে পারে প্রকৃতি! আবার এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রাণের উৎস। জল বায়ু ও মাটির উপাদান এই শুকনো শীষের থেকে জন্ম দেবে নতুন ঘাসের....

কি সূক্ষাতিসূক্ষ কারুকার্য গড়তে জানে প্রকৃতি! আমার এই দেহের মধ্যে কত জটিল সূক্ষ কারুকার্য! তার মধ্যে কোথায় কি ত্রুটি হয়ে যায়....

ক্রমশঃ আমার কথা হারিয়ে যাচ্ছে। আমার মধ্যে বেড়ে উঠছে ভাবনা। এত ভাবনা আমার মধ্যে ছিল আমি জানতামই না। কখনো আমি এমন খুঁটিয়ে কিছু ভাবিনি।

আজ শনিবার অর্ধদিবস ছুটির পরে আমি এখানে। অনুরাধার সাথে এরকমই কথা ছিল। কয়েকদিন ধরেই ভাবছি অনুরাধাকে কিছু আভাস দেবো। আজ ঠিক করেই এসেছিলাম কিছু বলব, কিন্তু -

ত্রুটি যুক্ত শরীরে আমার কিন্তু তেমন কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু যখন

আগামী ভয়ঙ্কর দিনগুলোর কথা ভাবি - যেমন শোনা যায় - চিকিৎসা তো কিছু নেই, শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষা - এভাবে ক্রমশঃ শয্যাশায়ী, ক্রমশঃ আরো যন্ত্রণার গভীরে চলে যাওয়া...মৃত্যু আসে ধীরে - ভাবতে গেলে আমার এমন হয় - কি অসহায় লাগে! এইতো এখন আমার চুলের মধ্যে জমে উঠছে ঘাম আর মাথা ঝিমঝিম করছে। অনুরাধা, তুমি আমাকে ভুলে যাও - বলতে চাইলাম আমি - অসুখ করলে মানুষ আরোগ্যের কথা ভাবে, জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে লড়াই করে সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য, কিন্তু আমার এ অসুখ আরোগ্যের নয়...

- কি হলো? তোমার ঠোঁট এমন কাঁপছে কেন? কপালে ঘাম কেন? কি হলো তোমার? - অস্থির অনুরাধা আমার কপালে হাত রাখল। আমি মৃতের চোখে ওর দিকে চাইলাম, কিছু বলতে পারলাম না।

শুধু অনুরাধাই নয়, যবে থেকে বাড়িটা কেনার কথা হয়েছে তবে থেকে সকলেই যেন বাড়িটা নিজেদের বলে ভাবতে শুরু করেছে। অথচ এ বাড়িতে আমরা আছি কত দীর্ঘকাল। আমার জন্মেরও আগে থেকে - তাই বা কেন, বাবার কৈশোর থেকে। জন্ম থেকে এতখানি জীবন আমি এই বাড়িতেই, তবু কখনো আমি এ বাড়িকে নিজের বলে ভাবতে পেরেছি?

আমার ভাই?

আমার মা? যিনি বিয়ের পর এবাড়িতে এসে উঠেছেন, তিনি?

মা বললেন - আগে বাপু ছাদে উঠবার একটা সিঁড়ি করা দরকার। এভাবে বললেন যেন বাড়ি কেনা হয়েই গেছে। সন্ধ্যায় আমি অফিস থেকে ফিরে চা খাচ্ছিলাম, মা ও এক কাপ নিয়ে আমার পাশে এসে বসলেন - আমি শুনেছি ভবানীপুরে কোন কোন দোকানে গয়না বিক্রি করলে ঠিকঠাক দাম পাওয়া যায়, তুই ভাল করে খোঁজ খবর করে তবে বিক্রি করিস, নাহলে ঠকতে হবে।

আমার নীরবতা মাকে নিরুৎসাহ করল কি? না জি উদ্বেগ? বললেন

কিছুদিন ধরে তোকে দেখছি খুবই মনমরা লাগছে, কেন বলত? তোর কি ইচ্ছা নয় বাড়িটা কেনার?

- কি বলছ মা - আমি বিস্ময়ে বললাম।

- তাহলে? গানে বসছিস না পর্যন্ত? ব্যাপারটা কি?

প্রথম দিকে গলার জন্য যখন ওষুধ খাচ্ছিলাম তখন মা কে ব্যাপারটা এমনই বলা হয়নি, মা ও আমার ওষুধ খাওয়া লক্ষ্য করেননি, কিন্তু আমি এখন অসুখ গোপন করি, ওষুধ আড়ালে রাখি।

- সর্দিতে গলাটা ব্যথা, এজন্য গানে বসা হচ্ছেনা।

ছোট ভাই ফেরাতে কথাটা চাপা পড়ে গেল, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

তারপর রাতের গভীরে ঘুমের ভিতর মাথা বেয়ে সিঁড়ি উঠে যায়...প্রায়শই আমার এখন ঘুম ভাল হয়না, কি যেন অস্বস্তি...

আজ রাতে স্বপ্নের ভিতর ছিল এক সিঁড়ি, না, মায়ের চাওয়া পাকা সিঁড়ি নয়, কাঠের মই। ছেলেবেলায় আমার বন্ধুর বাড়ি থেকে একটা মই চেয়ে এনেছিলাম, সেই মই বেয়ে ঘুঁড়ি লাটাই নিয়ে ছাদে, আজ স্বপ্নের মধ্যে সেই সিঁড়ি, সেই ঘুঁড়ি, লটাই হাতে সুতো ছাড়ি, ঘুঁড়ি যায় কতদূর....মেঘের ভিতর দিয়ে...সহসা সেই অস্বস্তি, গলার মধ্যে কাঁটা বেঁধার মতো চিন্ চিন্, দম বন্ধ হয়ে আসে যেন, ঘুম ভেঙে যায়, উঠে বসি, জানালা খুলে দিই, এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ছড়িয়ে পড়ে। বুক ভরে শ্বাস নিই...

কি নিস্তব্ধ রাত্রি, কি গভীর অন্ধকার! মৃত্যু - মৃত্যু কি এমনই কোনো নিস্তব্ধ গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া? তারপর? শুনেছি আত্মা অবিনশ্বর - গীতায় কি যেন আছে...জীর্ণ বস্ত্রের মতো আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীরে আশ্রয় নেয়...এরকমই কিছু, আমার পড়া নেই, শোনা মাত্র...আমার এ শরীর কি তাহলে জীর্ণ হয়ে এলো?

আসলে এসবই মানুষের কল্পনাপ্রসূত। মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়, এমনই কোনে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে ভয় পায়, তাই এসব কল্পনা করেছে, কল্পনা

করেছে পুনর্জন্মের। কল্পনা করেছে এই পৃথিবীতে ফিরে ফিরে এসে বসবাস করার, আর সম্ভবত এই চিন্তা থেকেই মানুষ সঞ্চয় করে সম্পদ...বংশানুক্রম...অর্থ নিজেরই ফিরে ফিরে আসা...

এ পৃথিবী বড় মায়াময়....বড় আকর্ষণীয় এ মাটি এ বাতাস...এ সংসার ভালবাসা। কত দুঃখ কত যন্ত্রণা সহ্য করে মানুষ, তবু বাঁচতে চায়! কি সুখে বাঁচে ভিক্ষুক? কি সুখে বাঁচতে চায় পথিপার্শে ভিক্ষাপাত্র রেখে গলিত কুষ্ঠরোগী?

উষ্ণ রক্তস্রোত ক্রমশঃ তীব্র হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে আমার মস্তিষ্কে। আমি বিছানায় এসে বসলাম। এই বাড়ি এই ঘর এই চার দেওয়াল এই বিছানা সব কিছু এত ঘনিষ্ট এত একাত্ম!

অথচ চারিদিকে দোতলা তিনতলা বাড়ি দিয়ে ঘেরা এই একতলা বাড়ির সব ঘরেই সারাদিন আধো অন্ধকার। এ বাড়ির ছোট উঠোনে রোদ অনুপ্রবেশ করতে পারেনা। এ বাড়ির সামনে কোনক্রমে একটা রিক্সা ঢোকার মতো রাস্তা। এই সঙ্কীর্ণ গন্ডির প্রতি এত টান?

রক্তের চাপ বুঝি ভেঙে দেবে মস্তিষ্কের আবরণ। কি ভীষণ গরম লাগছে আমার। ঘুম চাই... শান্তি চাই... শীতলতা...আমি উঠলাম, ড্রয়ার খুলে ট্যাবলেট বার করলাম। কি ঠান্ডা কাঁচের গ্লাসের জল, আমি এক গ্লাস জল এক নিঃশ্বাসে পান করলাম।

ক্ষীণ ঘন্টাধ্বনি শ্রবণে ক্রমশঃ তীব্র হতে আমার ঘুম ভাঙল। লেপ ঢাকা শরীর যদিও উষ্ণ তবু মুখের ওপর থমকে আছে হিম। খোলা জানালার ওপারে গাঢ় অন্ধকার। আস্তে আস্তে উঠে বসলাম আমি। ঘরের আবহাওয়া খুবই শীতল হয়ে আছে। নেমে আলো জ্বাললাম - ঘড়িতে পাঁচটা বেজেছে। জানালা বন্ধ করে দিলাম। এখন মাঝে মাঝেই ঘড়ির শব্দ আমার ঘুম ভাঙায়, অথচ এতখানি বয়স পর্যন্ত ঘড়ি যে ঘরে আছে ঘুমের মধ্যে টের পাইনি। শুধু ঘন্টার শব্দ কেন, ঘড়ির টক টক্ আওয়াজও আমার এখন তীব্র

লাগে। কিছুদিন ধরে ভাবছি ঘড়িটা মা কিংবা ভায়ের ঘরে দিয়ে দেবো, কিন্তু কৈফিয়ত কি দেবো একথা ভাবতেই পিছিয়ে আসি।

এই শুরু হলো ভাবনা! ভাবনাগুলি যেন শকুনের মতো আমাকে ঘিরে বসে থাকে ঘুমের মধ্যে, যেই জেগে উঠি অমনি ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

অথচ কত আনন্দময় সকালে আমি গান গেয়েছি - মনমোহন গহন যামিনী শেষে দিলে আমারে জাগায়ে....

আজ আমার রতনপুর যাওয়ার দিন। ছোট ঠাকুর্দার প্রেরিত সদানন্দর থেকে জেনে নিয়েছি খুঁটিনাটি। কথা আছে সদানন্দ ও খরিদ্দার আজ আমার জন্য অপেক্ষা করবে। অনুরাধার প্রতি আমার কোনো করনীয় নেই, কিন্তু মা ও ভাই তাদের ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্খা ও সুখস্বপ্নটুকু সার্থক করে দেওয়ার দায়ীত্ব আমার, তাই যত শীঘ্র সম্ভব কাজটা করে ফেলা উচিত। অন্যথায় আমি জানি আমার অসুখ একদিন শেষ করে দেবে এ সংসারের সব সঞ্চয় সমস্ত শান্তি।

থাক, ওসব চিন্তা, এখন আমাকে তৈরি হতে হবে, সেই রতনপুর - যেখান থেকে এসেছে আমার পূর্বপুরুষ - সেই উৎসমূলে যেতে হবে। এও জীবনের এক কাজ। যাদের ধারাবাহিকতায় আমি পৃথিবীতে তাদের জন্মভূমি আমার কাছে তীর্থক্ষেত্র। আশ্চর্য, এক একটা অনুভবের কথা আজকাল কি গভীর ভাবে মনে নাড়া দিয়ে যায়।

না ওঠেন সকলের আগে, আজ মা যখন উঠলেন তখন আমার পোষাক পরা শেষ। মা অবাক হয়ে বললেন - কিরে কি ব্যাপার?

- আজ রতনপুর যাবো।

- তাতো যাবি, কিন্তু এত সকাল সকাল -

- যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল, আবার ফিরতে হবে তো।

- তাহলে তোকে একটু চা জলখাবার করে দিই - মা ব্যস্ত।

- আমার এখনো খিদে পায়নি মা, তুমি শুধু চা কর। না করলেও চলত, আমি না হয় স্টেশনে গিয়ে খেয়ে নিতাম। মা আমার কথার উত্তর না দিয়ে চা করলেন, টোষ্ট, ডিমসেদ্ধ।

শূণ্য প্রান্তর ধীরে ধীরে ভরে উঠছে রোদে।একটু স্পষ্ট হয়ে উঠছে দূরের গ্রাম। এক একটি স্টেশনে গাড়ি এক মিনিট দাঁড়াচ্ছিল আবার ভোঁ বাজিয়ে ছুট, যেন প্রত্যেকটি স্টেশনের ঘুম ভাঙাতে বেরিয়েছে রেলগাড়িটি। প্রায় ফাঁকা ট্রেনে জানালার ধারে বসে বড় ভাল লাগছিল আমার। খুবই ঠান্ডা হাওয়া লাগছে, তবু জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছা হয়না। কতদিন যে ট্রেনে চড়িনি! শেষ কবে ট্রেনে উঠেছিলাম আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে পড়ল না। এখন মাঘ মাস, এখন বোধহয় শষ্যের সময় নয়। মাইলের পর মাইল দেখছি শূন্য প্রান্তর পড়ে আছে। নতুন ধান্যে হবে নবান্ন - হ্যাঁ, সেতো পউষ মাস, পউষ তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে আয় আয় আয়, ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে - ধান কেটে নেওয়া মাঠে কি শূন্যতা...আমার বুকের মতো...

স্টেশনে নেমে নির্দেশ লেখা কাগজটি বার করলাম - ওভার ব্রীজ পেরিয়ে ডান দিকে যেতে হবে।

ঝকঝকে রোদে কতক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে একটা গ্রাম দুটো গ্রাম পেরোলাম, গরম লাগছে, ফুলহাতা সোয়েটার খুলে কাঁধে, এরপর রতনপুর পৌছনার কথা, মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে ঠিকই এগোচ্ছি, কিন্তু কি যে হলো, দেখলাম কিছুদূরে খোলামেলা একটা নদী, দাঁড়িয়ে পড়লাম।

কাউকে দেখছি না জিজ্ঞেস করব, নদীর কথা লেখা নেই। শিমুলগাছা, বানডাঙা - দুটো গ্রাম পেরিয়েছি, এবার রতনপুর, বোধহয় কোথাও দ্বিধাবিভক্ত পথ ফেলে এসেছি –

ঠিক রাস্তা খুঁজে যখন রতনপুর পৌঁছলাম তখন সাড়ে নটা। বাড়ি থেকে বেরিয়েছি পৌনে ছটা, এমন কিছু বেশি সময় নয়, অথচ মনে হয়

অন্য কোন জগতে এসে পৌঁছেছি। শরীরটা বেশ বাল লাগছে।

গ্রামে ঢোকার মুখে সদানন্দ দাঁড়িয়ে।

মাটির উঁচু পাঁচিল, পাঁচিলের ওপরটা খড়ের ছাউনি।

পাল্লাহীন একটা দরজা পেরিয়ে উঠান, তারপর আবার একটা দরজা পেরিয়ে ভেতরের বাড়ি। দুয়ারে রোদে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ, তাঁর গায়ে সুতির মোটা চাদর, অল্পসল্প চুল সবই সাদা, মুখে বলিরেখা। সদানন্দ বলল - আপনার ছোট ঠাকুর্দা। আমি প্রণাম করলাম। আমার মাথায় হাত দিয়ে অস্ফুটে আশীর্বাদ করলেন, পাশে বসতে বললেন। আমি মাদুরে বসলাম। সামনে এসে যিনি দাঁড়ালেন বুঝলাম ইনিই ছোট ঠাকুমা। আমি উঠে প্রণাম করলাম।

নারকোল নাড়ু দিয়ে মুড়ি খেতে খেতে যা বৈষয়িক কথাবার্তা হলো তাতে জানলাম ভিটে মাটি ছাড়াও আমাদের কিছু ধানজমি আছে, সে জমি উনিই ভোগ দখল করেন। এত দীর্ঘ দিন কেউ খোঁজ করেনি, এখন আমি এসেছি যখন তখন উনি আমাদের জমি দিয়ে দিতেই চান। এতদিন রক্ষণাবেক্ষণ করে জমি তিনি ফেরৎ দিতেন না, কিন্তু না দিয়েই বা কি করবেন! ওনার ছেলেরাও সব বাইরে চাকরি করে, দৈবাৎ আসেটাসে। শরীর তাঁর জীর্ণ হয়ে আসছে, সবই চলে যাবে পরের হাতে, তাই বিক্রি করে দেওয়াই ভাল।

খুবই বিষন্ন শোনাচ্ছিল ওঁর কন্ঠস্বর, স্বগতোক্তির মতো বলেই চললেন - চলে যাবে, সব চলে যাবে, সব চলে যাবে। শুনতে শুনতে আমার কেমন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এক জনের বুক দিয়ে আগলে রাখা ধন আমি হরণ করে নিতে এসেছি।

বড় বড় গাছ আর জঙ্গলে ঢাকা যে জায়গাটা সদানন্দ আমাকে নিয়ে দেখাল সেখানে ঘরবাড়ির চিহ্নও নেই। তারই মাঝে ঢিবির মতো কিছু একটা, ওটাই আমার পূর্বপুরুষের ভিটে!

কেমন এক অনুভব আমাকে ঘিরে ধরছিল ওই জঙ্গলের মতে। কতকাল ধরে এই ভিটেতে বংশপরম্পরায় জন্ম নিয়েছে কত শিশু, খেলা করেছে বড় হয়েছে, জীবন যাপন করেছে, আবার হারিয়েও গেছে কালের অতলে। এই পৃথিবীতে কেন আসা কেন যাওয়া? না, যেতেই হবে তাই যাওয়া। যেতে কে চায়?

....শুধু চিরকাল খেলা করে রোদ হাওয়া মেঘ ও বৃষ্টি....

কত কিছু যে ইতিমধ্যে রান্না করেছেন ঠাকুমা এই জীর্ণ শরীর নিয়ে! খেতে বসে অবাক আমি বললাম - বাবাঃ এত!

- কে আর এত রাঁধে বাবা! বুড়ো বুড়ি আছি, সামান্য কিছুতেই চলে যায়। অথচ এককালে ওই মানুষটার খাওয়ার কত - ভাবনা চিন্তা মানুষটাকে আরও জীর্ণ করে দিলো - বিষন্ন গলায় বললেন - জমিতো নয় বুকের পাঁজর! কিন্তু দেখাশোনা করতে পারেন না।

আমার গলা দিয়ে ভাত নামছিল না। উনি বোধহয় বুঝতে পারলেন, বললেন - খাও বাবা, না খেলে মনে বড় কষ্ট পাবো।

আমাদের ভিটেমাটির ভবিষ্যৎ মালিকের হাতে দলিলের জেরক্স কপি তুলে দিয়ে ফেরার তোড়জোড়। সব কিছু তৈরি হলে সদানন্দ আমাকে খবর দেবে। দাম দস্তুর ঠাকুর্দাই ঠিক করে দেবেন। বেলাবেলি বেরিয়ে পড়াই ভাল। অনেকটা পথ যেতে হবে।

বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল কেন জানিনা। শীতের পড়ন্ত রোদ্দুরে কেমন এক বিষন্নতা আছে, ট্রেনের জানলায় বসে আমি দেখলাম সমস্ত পৃথিবী কেমন বিষন্নতায় ডুবে যাচ্ছে।

যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। একটু বাতাস নেই। ধোঁয়ায় চারিদিক কি অস্বচ্ছ। গলির মুখে আমাকে থমকে দাঁড়াতে হলো, গলাটা ব্যাথা করছে। সারাদিন ওকে ভুলেই ছিলাম। এমনকি ভোর বেলা যখন মুখ ধুচ্ছিলাম তখনও ও রোজ সকালের মতো সাড়া

দেয়নি। রক্তের রিপোর্ট টা আনা হলোনা আজ, কাল আনতেই হবে।

.... একটা ছোট পাখি গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করছিল, এগাছ থেকে ও গাছ - আর গান গাইছিল - আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও...সবুজ পাতার আড়ালে আমি, আমার গায়ে পাতার ছোঁয়া - আমি গান গাইছিলাম...জঙ্গলের ওপারে দাঁড়িয়ে মা, মা কি আমাকে খুঁজছে? পাখি আমি উড়ে গিয়ে বসলাম আরো উঁচু ডালে বৃক্ষের শীর্ষে....ওইতো আমি দেখতে পাচ্ছি পোড়ো ভিটের স্তূপ...পোড়ো স্তূপ কোথা? ওইতো একতলা বাড়ি, কি সুন্দর সিঁড়ি হয়েছে! মা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে ছাদে, আমাকে খুঁজছে নাকি? এইতো মা আমি গান গাইছি...শুনতে পাচ্ছনা? আমি মায়ের কাছে উড়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু পারছি না, পড়ে যাচ্ছি, বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল ভয়, আমি এজটা কিছু প্রাণপনে আঁকড়ে ধরতে চাইলাম....

ঘুম ভেঙে আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মৃত্যু আমার কাছাকাছি, আমাকে সে নিয়ে যাবে কোথায়? আজ রক্তের রিপোর্ট পাওয়া যাবে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামি আজ পেয়ে যাব চুড়ান্ত পরোয়ানা। নিজের মুখ নিজ হাতে ছুঁয়ে দেখলাম, বুকের ওপর দুহাত রেখে পড়ে রইলাম মৃতের মতো।

রক্তের রিপোর্ট টা এবেলাই নিয়ে নেওয়া ভাল, তাহলে ওবেলা অফিস থেকে ফিরে ডাক্তারের কাছে যাওয়া যাবে। কি গোপন জীব কুরে খায় রক্তের ভিতর! কি ভীষণ অবসাদে জীর্ণ আমি স্নানঘরে ঢুকলাম। এবার ব্যথার প্রস্তুতি - কল খুললাম -

মাথার ওপর কি যেন পড়ল? কুটো না কি? ওপর দিকে চাইলাম, মাথার ওপর বাথরুমের ছোট জানলা , ওখানে কি পাখিটাখি বাসা করেছে? ভাল করে দেখতে চাইলাম, না কিছুই চোখে পড়ছে না, শুধু নিঃশব্দে সাপের

মতো কুন্ডলী পাকিয়ে জানালা দিয়ে ঢুকছে ধোঁয়া। ও পাশেই মন্টুদার চায়ের দোকান, উনুনে আঁচ দিয়েছে। ঘাড় উঁচু করে দেখতে গিয়ে সহসা আমার গলায় ব্যথা - কিন্তু এখনো তো আমি জল ছুঁইনি! আমি বড় করে শ্বাস নিতে চাইলাম, ব্যথা আরো তীব্র, ধোঁয়া গড়িয়ে নেমেছে আমার ওপর। সন্দিগ্ন মনে আমি আরও কয়েকবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলাম, ব্যথা আরও তীব্র হয়ে উঠল।

ব্যথাটা কি ধোঁয়া থেকে হচ্ছে? গতকাল, শুধুমাত্র গতকাল আমি অনেক ভোরে বাথরুমে গেছি, গতকাল আমার কোনো ব্যথা ছিল না।

সারাদিন আমি ধোঁয়া সম্পর্কে সজাগ। এর থেকে ডাক্তারবাবু যদি কোনো অসুখের নির্দেশ পান। অফিসে আমার সামনের টেবিলে অবিনাশ বাবু কাজের ফাঁকে মাঝেমাঝে সিগারেট ধরান, আমি লক্ষ্য করলাম যখনই ধোঁয়া আমার দিকে ভেসে আসছে তখনই আমার গলায় ব্যথার অনুভব।

তারপর সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফেরার সময় লক্ষ্য করলাম চাপ চাপ ধোঁয়ার মধ্যে দিয়েই আমি হাঁটছি আর গলায় ব্যথা তীব্র হচ্ছে।

রক্তের রিপোর্টে কিছু পাওয়া গেলনা। ডাক্তারবাবুর মুখে চিন্তার রেখা। আমি অনেক সঙ্কোচের সঙ্গে ডাক্তারবাবুকে আমার সারাদিনের অভিজ্ঞতার কথা বললাম। আমি বুঝি বানে ভাসা মানুষের মতো খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইছিলাম।

- তাই নাকি? তাহলে আপনি নিজে সিগারেট খাওয়ার সময়তো ব্যথা পাবেন।

- কিন্তু আমিতে সিগারেট খাইনা - সাগ্রহে বললাম আমি।

- তাই নাকি? কিন্তু যখন জানতে চেয়েছিলাম -

ডাক্তারবাবু একটা সিগারেট ধরালেন, জোরে আমার মুখের ওপর ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলেন, আমি কাতর শব্দ করে উঠলাম।

- আপনাকে দেবার মতো কোনো অষুধ নেই, ধোঁয়া এড়িয়ে চলুন। শীতকাল কেটে গেলে এমনিই অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবেন। খুবই ভাল হয় যদি সমুদ্রের ধারে বা পাহাড় জঙ্গলে সবুজের মাঝে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতে পারেন। এ আপনার সারা জীবনের সমস্যা হয়ে গেল।

এ হলো স্মোক এ্যালার্জি। বয়সকালে চিন্তা আছে। কাশি, শ্বাস কষ্ট -

মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়ে যাওয়া কোনো মানুষের মতো আমি। এ কেমন অনুভব? এও কি আনন্দ? কিন্তু পরক্ষনে বিমর্ষ আমি, এ যে আমার সারা জীবনের সমস্যা! বয়সকালে -

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে পথে পা দিলাম। বাতাসে ধোঁয়ার আস্তরণ, গলার মধ্যে চিনচিন করে উঠল ব্যথা। কোন পথে যাব আমি! কোথায় পালাবো?

.... সমুদ্র... এ্যালবাট্রাস... মুক্ত আকাশ বাতাস আমাকে বড় হাতছানি দেয়, কিন্ত আমি বন্দী বিহঙ্গ...আমার অফিস, আমার বাড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে চারপাশের উঁচু বাড়িগুলো।

.... খোলা আকাশের নীচে ছাদে শুয়ে আছি... চারপাশে হুমড়ি খেয়ে আছে উঁচু বাড়িগুলো... না না বাড়ি কোথা, চারপাশে ঝুঁকে আছে বড় বড় গাছেরা....দোলায় শাখা...বড় শান্তি... এরকম স্বপ্নের মাঝে ঘুম ভাঙল ভোর বেলা। বড় শান্তির ঘুম এসেছিল কাল রাতে। কিন্ত এ স্বপ্ন আমাকে কোন পথে নিয়ে গেল? উঠে পড়লাম, ব্যস্ত আমি ঢুকলাম স্নানঘরে।

মা আমি বেরুচ্ছি, যাব রতনপুর - মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বললাম আমি, বেরিয়ে পড়লাম।

তখন বেলা নটা। ঠাকুর্দা মাদুর পেতে উঠোনে বসে রোদ পোহাচ্ছেন ও পায়ে তেল মাখছেন

মাদুরের এক ধারে বসলাম। অবাক হয়ে তাকালেন তিনি -

- কি ব্যাপার?

- আচ্ছা দাদু, আমাদের ভিটের জমি কতটা?

- কাঠা দশেক - কেন?

- মাত্র দুকাঠা আমাদের জন্য রাখা যায়না?

- কেন ভাই?

- একটা ঘর করব, খড়ের বা টালির চালের।

- কেন রে?

- মাসে দু তিন দিন এসে থাকব।

ঠাকুর্দা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে অবাক চোখে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা হাত আমার দুগালে বুলিয়ে বুলিয়ে কি যেন অনুভব করতে চাইলেন, অস্ফুটে বললেন আসবে? থাকবে? ওগো শুনছ? নাতি কি বলছে?

- শুনছি তো! - কাছে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুমা – ঘর না হয় হবে, তুমি এখনই মাঝে মাঝে এসে থাকো না ভাই, আমি পুবের ঘরটা পরিস্কার করে রাখবখন, অমন খাট রয়েছে!

-হ্যাঁ, ভোর বেলা খেজুর রস খাওয়াবো, আর পাতলা নলেন গুড় দিয়ে মুড়ি, ও জিনিস তুমি শহরে পাবেনা! – দাদু বললেন।

- হ্যাঁ গো, সদানন্দকে বলনা ক্ষেত থেকে বড় বড় দুটো ফুলকপি তুলে এনে খোকাকে দিতে –

.....জীবন কি মধুর! কি মধুর এ বাতাস, ওই নীলাকাশ.... এমন ভালবাসা!....

(রচনাকাল ১৯৮৫)

পারাপার

মনোজ:

মেঘে ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে আসছিল চরাচর। দূরের পাহাড়গুলি একেবারেই অদৃশ্য। যে তুষার ঢাকা নদী আমরা পার হয়ে এসেছি ঘন্টা খানেক আগে, তারপর এই পাহাড়ের পথ ধরে উঠতে উঠতে অনেক উঁচুতে চলে এসেছি। সেই নদীও অদৃশ্য। অথচ একটু আগেও পাহাড়ী পথ ধরে মাঝে মাঝে দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল নীচের দিকে ওই নদী গর্ভে, যেখানে সারিবদ্ধ ভাবে নদী পার হচ্ছে তখনও কিছু মানুষ। যদিও ঘোড়াওয়ালা বার বার সাবধান করছিল, বারণ করছিল নীচের দিকে তাকাতে।

পাহাড়ে গা বেয়ে ঘোড়ায় নামছি সাবধানে। পথ এখানে বড়জোর দু ফুট মাত্র চওড়া।

কোথায় সমতল? চোদ্দ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে নেমে কবে পৌঁছাবো? সেই সমতলের কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম, মনটা আঁকুপাঁকু করে উঠল সমতলের জন্য।

চকিতে বিদ্যুতের ঝলক, প্রায় মাথায় ওপর দিয়ে ছুটে চলে গেল আকাশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত, তার ভীষণ গর্জন কাঁপাল গম্ভীর পর্বতের বিশাল শরীর। বুকের ভেতর সেই শব্দ কি ভীষণ ভয়ের কম্পন ছড়িয়ে গেল, মনে হলো আমি ঘোড়া থেকে পড়ে যাব। চারেদিকে তাকালাম, শূন্যে ভাসমান এক শিলাখণ্ডের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আশেপাশ ওপরে নীচে চারিদিকে মেঘ। আমার সামনে দুতিন হাত মাত্র দূরে ঘোড়ার ওপর দেবারতি, ওর ঝাপসা অবয়বে হলুদ সোয়েটার আর দীর্ঘ বিনুনির আভাস। ওর সামনেও কয়েকজন ছিল জানি, কিন্তু তারা আছে না আরো এগিয়ে গেছে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার পিছনেও কয়েকজন ছিল কিন্তু

পিছন ফিরে তাকাবার উপায় নেই।

দেবারতির ঘোড়াওয়ালাকে দেখা যাচ্ছিল না, ও যেন গোড়ার এক ভগ্নাংশে বসে ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে। আমি ওকে ডাকতে চাইলাম, কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো আমি একটা ভয়ানক ভুল করতে চলেছি, ও হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাতে গেলে বিপর্যয় ঘটে যাবে, ঘোড়া থেকে পড়ে -

যদিও এসব চিন্তা মুহূর্তের তথাপি একটা অর্থহীন চাপা শব্দ ভয়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। আমার ঘোড়া ওয়ালা আমার সামনে ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটছে, দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাল, বলল ডরো মৎ, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘোড়ার লাগামে সামান্য টান দিয়ে উঠতে লাগল।

আবার বিদ্যুতের ঝলক - এবার আরো তীব্র। তার ভীষণ শব্দের রেশ যে কতক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল! শুরু হলো টিপটিপ বৃষ্টি। বর্ষাতি গায়ে দিয়ে নাও দেবারতি - বলতে গেলাম আমি, কিন্তু দেবরতি কোথায়? সামনে কেউ নেই।

বুকের ভেতর ধ্বকধ্বক শব্দ - ভয় - কি ভীষণ ভয়ে সিটিয়ে গেলাম আমি। পথ মাত্র দেড়-দুহাত চওড়া, তার ডানদিকে পাথুরে খাড়াই বাঁদিকে গভীর খাদ, সে খাদও এখন মেঘে অদৃশ্য, যে কোন মুহূর্তে -

- ইসমাইল - ভয়ার্ত গলায় আমি ঘোড়াওয়ালাকে ডাকলাম -

- জী সাব্ -

- সামনে কাউকে দেখছি না কেন?

- সামনে বাঁক আছে - সামালকে -

সামনে ঘুরে গেছে পথ, আমরা বাঁক নিলাম, হ্যাঁ, ওইতো দেবারতির ঝাপসা অবয়ব, বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছ ও, খুবই ঝাপসা –

এখানে পথ সামান্য ঢালু, বোঝা যায় নামছি। বৃষ্টির বেগ বাড়ছে, আমি বর্ষাতি গায়ে দিতে গিয়ে টালমাটাল অবস্থা -

- সামালকে সাব্ - ঘোড়াওয়ালা ঘোড়া দাঁড় করালো, আমি কোনক্রমে বর্ষাতি

গায়ে দিলাম। দেবারতি কি বর্ষাতি গায়ে দিতে পেরেছে?

মুহুর্মুহু গর্জন করে মেঘেরা শুরু করল প্রবল বর্ষণ, আরও অন্ধকার হয়ে এলো চারিদিক। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে আসছে জলধারা, পথের ওপর বেয়ে নেমে যাচ্ছে খাদে। পথ পিছল, ঘোড়াওয়ালা নামছে পা টিপে টিপে, ঘোড়াও দেখছি পা ফেলছে সাবধানে। সমতলে মুষলধারে বৃষ্টি অনেক দেখেছি, কিন্তু এ যেন জলপ্রপাতের ধারা।

কে যেন কেঁদে উঠল, তার কথা কিছু বোঝা না গেলেও আর্তস্বর কি করুন। কে কাঁদলো? ও শব্দ কি সামনে থেকে এলো না কি পিছন থেকে? এ কি দেবারতির কণ্ঠস্বর? ওকে দেখতেও পাচ্ছিনা। আমারও বুকের মধ্যে জমে উঠেছে কান্না। মনে হচ্ছে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ি, সামনের পথ ধরে ছুটে যাই।

বৃষ্টিধারার ভিজে জবুথবু হয়ে যাচ্ছে ঘোড়া, মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে, ঘাড় ঝাঁকাচ্ছে। ঘোড়াওয়ালা যতটা সম্ভব ওর গা ঘেঁসে। সহসা ঘোড়াটি সামনে ঝুঁকে পড়তে গিয়েও সামলে নিল, আমি হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ঘাড়ের ওপর, গলা জড়িয়ে সামলে নিলাম। ঘোড়াওয়ালা ঘোড়াকে ধরে ফেলল, ব্যাস্তভাবে নামতে বলল আমাকে। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর পথে নামব কোথায়? আমার পা কাঁপছিল, নামতে গিয়ে যদি পড়ে যাই খাদে?

ঘোড়াওয়ালা ধমক দিয়ে উঠল - উতারিয়ে, জলদি উতারিয়ে - আমার বাহু ধরল সে, নামিয়ে দিল। খাদের প্রান্তে কোনক্রমে দাঁড়ালাম আমি।
আমার লাঠি ছিল ঘোড়াওয়ালার হাতে, লাঠিটা আমার হাতে দিল সে, ঘোড়াকে দুকদম সরিয়ে নিল। প্রবল বৃষ্টিধারার দাপট সামলে কোনরকমে আমি পথের ওপর সরে এলাম। এত অসহায় লাগছিল নিজেকে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি আমি, ক্রুদ্ধ প্রকৃতি আমাকে ফেলে দেবে কোন অন্ধকারে।
-পয়দল মে যাইয়ে – বলে সে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, ফিরে চলল।

চলচ্ছক্তিহীন আমি বসে পড়লাম।

আর দেবারতি? কোথায় সে? হায়, এ আমি কি করলাম! কেন এখানে এলাম! নিশ্চিন্ত আরামে বেড়াবার মতো কত জায়গা আছে, সেসব ছেড়ে আমি এই দুর্গম পথে -

এখন এই পড়ন্ত বিকেলে আমাদের শান্ত গ্রামের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে হলুদ সবুজ ট্রেন...কলাগাছেরা দুলছে...রেল লাইনের পাশে নয়ানজুলিতে কেঁপে উঠল ঢেউ... মনটা হু হু করে উঠল, কি অসহায় ভাবে আমি মৃত্যুর মুখোমুখি। প্রচণ্ড শীত লাগছে।

তীব্র আলোকচ্ছটা আর বজ্রপাতের শব্দ - লাঠির ওপর ভর দিয়ে কাঁপুনি থামাতে চেষ্টা করলাম। সামনে পথে হুড়মুড়িয়ে নেমে এলো ধ্বস।

সমুদ্র মানে পুরী আর পামাড় মানে দার্জিলিং - এইতো বাঙালীর হানিমুনের উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু! - দেবারতি বলেছিল।

আমি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলেছিলাম - আমরা ওখানে যাচ্ছিনা।

- তাহলে কোথায়? - দেবারতি বিস্মিত - আমিতো ভেবেছিলাম দার্জিলিং থেকে খু-উ-ব ভাল এক কিলো চা নিয়ে আসব।

-ছ্যা ছ্যা! - বাঙালির চিন্তা আর কতদূর যাবে! - আমি দেবারতিকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছিলাম - আমরা যাবো কোনে দুর্গম পাহাড়ে, যেখানে তুষার ঢাকা পাহাড় চূড়া, তুষার ঢাকা নদী -

দেবারতি, এখন তুমি কোথায়? কি ভাবে আছ? তুমি কি পেরিয়ে যেতে পেরেছ ওই ধ্বসের এলাকা? নাকি ওই বিশাল ধ্বস তোমাকে - না না, এ হতে পারে না, মাথার মধ্যে কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে....

.... আমাদের বাড়ির পিছনে বকুল গাছের তলায় আমি আর দেবারতি বসে আছি.... শিরশির বাতাস বইছে... চোখ বুজে আমি ভাবতে চাইলাম...

কি ভীষণ শীত লাগছে! ভিজে মোজা জুতোর ভেতরে মনে হচ্ছে পা

দুটো বরফ খণ্ডের ভেতর ঢোকানো। বৃষ্টির বেগ মনে হচ্ছে কমে এলো। সেই সব মানুষগুলি এখন কোথায় যাদের একটু আগে দেখেছিলাম তুষার নদী হেঁটে হেঁটে পার হচ্ছে? আমার পিছনেও ছিল কয়েকজন, তারাই বা কোথায়?

মেঘ কেটে যাচ্ছে....নাকি মেঘের চাদর দ্রত গুটিয়ে রাখছে প্রকৃতি....দূরের পাহাড়শ্রেণী আবার দৃশ্যমান... কেমন আশা জাগছে বুকে...আমার ঘুম পাচ্ছে...তিন দিন হয়ে গেল হাঁটছি আর হাঁটছি.....রাতে তাঁবুর মধ্যে সামান্য ঘুম, বড় ক্লান্তি...দেবারতি আলোটা নিভিয়ে দাও...

নাঃ, মাথার মধ্যে আবার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন কি করতে হবে? ওই ধ্বসের ওপর দিয়ে ওঠা যাবেনা? পেরিয়ে যাওয়া যাবেনা? পথ কত দূর? উঠে দাঁড়াতে হবে, চলতে হবে।

দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাঁটু দুটো যেন জমে গেছে। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম - কিছুটা উঠেও বসে পড়তে হলো।

ভয় পাচ্ছি আমি? ভয় কি আমাকে অকেজো করে ফেলছে? না না, আমি খুব সাহসী, আমি এক ছুটে পেরিয়ে যাব ওই ধ্বসের প্রাচীর, শুধু পা দুটো একটু -

জুতো মোজা খুলে ফেলা দরকার -

জুতো মোজা খুলে আমি এ্টু আরাম বোধ করলাম। বর্ষাতির বোতাম খুলে ফেললাম।

প্যান্টের নীচের দিকটা ভিজলেও ওপর দিকটা কিছুটা শুকনো আছে। সোয়েটারও কিছু ভেজা কিছু শুকনো। বর্ষাতির টুপি খুললে মাথাটা বেশ হালকা লাগল। বর্ষাতি পুরোপুরি খুলতে গেলে দাড়ানো দরকার। এমন কিছু ঘটেনি যাতে আমার পা অকেজো হয়ে যেতে পারে। আমি কি দীর্ঘক্ষণ হেঁটেছি? না। আমি কি সারাদিন উপবাসী? না। আমি কি প্রচুর পরিশ্রম করেছি? তাও নয়। আমি ঘোড়ায় চড়ে হেলতে দুলতে আরামেই চড়াই

উৎরাই পার হয়েছি। তাহলে? শুধু মাত্র ভয় আমাকে কাবু করেছে, আর কিছু নয়। সাহস চাই, বল চাই, সাহসই বল! কিন্তু এই নির্জন পর্বতের গায়ে সামান্য মাত্র পথের ওপর দাঁড়িয়ে অবরুদ্ধ আমি, দমে যায় মন। একজন, মাত্র একজন মানুষ যদি পাশে থাকত!

দে-বা-র-তি - চিৎকার করে ডাকলাম - কিন্তু ধ্বসের ওদিক থেকে কোনো উত্তর এল না।

- ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন - মনে মনে বললাম, মন্থর পায়ে সাবধানে ধ্বসের দিকে এগিয়ে চললাম।

সমস্ত উৎসাহ এক মিনিটেই নিভে গেল, হতাশ হয়ে দেখলাম পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ধ্বসে ঝুরঝুরে মাটি আর ছোট বড় পাথরের মিশ্রণ, এর ওপর ওঠার চেষ্টা করা মানে কিছু মাটি আও পাথরের সঙ্গে সজ্ঞানে নিজেকে ছুঁড়ে ফেলা গভীর খাদে।

...আবার তেড়ে আসছে ভয়...মাথার মধ্যে আবার গোলমাল...

মাথা ঘুরছে...পিছনের মানুষগুলোই বা কোথায়? তাদের কাছে পেলেও অন্তত...

ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম। এদিকে রাস্তা ক্রমশঃ চড়াই তবে নুড়ি আর পাথর ছড়িয়ে আছে কম। হাঁটতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। তবে হাঁফ ধরে যাচ্ছে। একটু দাঁড়ালাম। মেঘহীন ঝকঝকে উপত্যকা - নীচে কতদূর দেখা যায় তুষারাবৃত নদী ওই দূরে তুষারের মুকুট পরা পাহাড়গুলোর পাশ দিয়ে বাঁক নিয়ে হারিয়ে গেছে। কোথাও সবুজের কোনো চিহ্ন নেই। শুধু তুষার আর প্রস্তর ভূমি। কি বিশাল প্রকৃতি এখানে একত্রে ধরা পড়ে দৃষ্টির নাগালে! সব শান্ত নিশ্চুপ। কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। একটু আগে প্রকৃতির সেই ভয়ঙ্কর রূপের কথা ভাবা যায়? চিন্তা ভয় অস্থিরতা সব কিছুই এই মুহূর্তে প্রশমিত। কিন্তু হাঁটতে হবে, খুঁজে পেতে হবে –

কি খুঁজে পেতে হবে? আশ্রয়? সঙ্গী? আমি চড়াই পথে এগিয়ে চললাম। সামনেই দেখতে পাচ্ছি বাঁক।

ওখানেই দেবারতি দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। বাঁকের ওদিকে আছে কি কেউ? থাকলে তো এগিয়ে আসতো। তাহলে তারা গেল কোথায়? বাঁক ঘুরলেই দেখতে পাবো দীর্ঘ পথ। আমিও সাগ্রহে এগিয়ে চললাম। হাঁফিয়ে যাচ্ছি, তবু দাঁড়ালে হবেনা।

বাঁকের প্রান্ত ঘুরেই - আঃ - দৃষ্টি থমকে গেল - এক বিশাল ভাঙনে পথ নিশ্চিহ্ন। প্রায় পনেরো-কুড়ি ফুট জায়গা পথ বলে কিছু নেই।

দেবারতি :

ঘোড়ায় চড়া যে এত কষ্টের কে জানতো রে বাবা! সিনেমার নায়ক নায়িকারা কেমন সুন্দর হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে ঘোড়ায় চড়ে ফুর্তি করে, কিন্তু এ এক ঢেঁকি কল! তার ওপর আবার চড়াই উতরাই, সামলে বসাই দায়! খালি মনে হয় পড়ে যাই পড়ে যাই। তার ওপর আবার ঘোড়াওয়ালা পই পই করে পিছনে তাকাতে বারণ করেছে। মুশকিল আরকি! ও আমার ঠিক পিছনে আছে? কাঁহাতক আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলা যায়! এর ওপর আবার শুরু হলো বৃষ্টি! কি ঝামেলা রে বাবা। তিন দিন ধরে পথ চলছি যহোক বৃষ্টি ফিষ্টি ছিল না। সোজা রাস্তায় মাঝে মাঝে হাঁটাও গেছে। কিন্তু এ আবার কি শুরু হলো। ও ঘোড়াওলা, একটু দাঁড় করাও না, বর্ষাতিটা গায়ে দিয়ে নিই।

- কি গো, তুমি পেছনে আছ? - সাড়া নেই - মানে পিছিয়ে পড়েছে। ওর ঘোড়াটা তেমন তেজিয়াল নয়। আমার ঘোড়াটা খুব সুন্দর! কেমন ধবধবে সাদা রঙ! কি সুন্দর স্বাস্থ। চলো ভাই ঘোড়াওলা। আমার কত্তাকে দেখতে পাচ্ছ?

- নেহি বহিন - ঘোড়াওয়ালা রাবারের বর্ষাতি গায়ে দিতে দিতে বলল।

- ও মা, তাহলে? চারদিক যে মেঘে ঢেকে গেল! এতো জোর বৃষ্টি এসে গেল

-- ঘাবড়াও মত্, রাস্তাতো এক হি হ্যায়, যায়েগা কিধার?

- একটু দাঁড়াও না ভাই।

- ইতনা বারিষ মে রাস্তেকা উপর খাড়া রহনা ঠিক নেহি। চিৎকার করে বলল সে।

.... বৃষ্টি বড় জোর এলো। চারপাশে মেঘ। যেন ভেসে আছি। মুখে চোখে বৃষ্টি যেন থাপ্পড় মারছে। জলের কি তোড়! এত সরু রাস্তা তার ওপর আবার এত জলের তোড়, ঘোড়ার পা পিছলে পিছলে যাচ্ছে। বড় ভয় করছে, ঘোড়া পড়ে যাবে না তে? হে ভগবাব, হে বাবা শিব, বাঁচাও বাবা! তোমাকে দর্শন করতে এসে এ কি দুর্ভোগ। ও ঘোড়াওলা থামো থামো, আমি হেঁটে যাবো।

- চিল্লাও মত্ - চিৎকার করে উঠল ঘোড়াওয়ালা। মুখ ফিরিয়ে এক পলক তাকিয়ে পুণরায় যেভাবে চলছিল সেভাবেই চলতে থাকল। আমি আরো ভয় পেয়ে গেলাম। কান্না পাচ্ছে।

- কিন্তু ঘোড়া যদি পড়ে যায়?

- এ ঘোড়ে কোই আলতু ফালতু ঘোড়ে নেহি - চিৎকার করে উঠল সে - একদম ঠিকঠাক চলেগা, ডরো মৎ -

বজ্রপাতের আওয়াজে ওর কথা চাপা পড়ে গেল। বড় ভয় করছে। মন মানছে না। ও কত পিছনে? কি করছে? ওর ঘোড়া চলতে পারছে তো? যদি পড়ে যায়? হে ভগবান, ওকে রক্ষা করো।

সহসা ঘোড়াওয়ালা থমকে দাঁড়াল, ঘোড়ার লাগাম কষে ঘোড়াকে পিছনে হাঁটাতে চাইল। ঘোড়াও সাবধানে পা ফেলে পিছোতে লাগল।

- হুশিয়ার - চিৎকার করে বলল সে, আমি চমকে সামনের দিকে তাকালাম - পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে কাদামাটি আর পাথরের স্রোত। মুহূর্তের মধ্যে বিশাল স্তূপ পথ রুদ্ধ করে দিল। আমি আর্ত চিৎকারে কেঁদে উঠলাম।

- ঘাবড়াও মত্, মত্ ঘাবড়াও, - বলল সে, কিন্তু ওর গলায় তেমন জোর নেই।

বৃষ্টির বিরাম নেই। যদিও মেঘের ঢাকা সরে গিয়েছে, মাঝে মাঝে ছিটকে নামছে পাথরের কুচি, কোনটা রাস্তায় পড়ে থাকছে, কোনোটা তীব্র বেগে ছিটকে যাচ্ছে খাদে। ওরকম ধ্বস যদি আমাদের ওপর নেমে আসে?

আবার বিদ্যুতের চমক, আাবার ভীষণ গর্জন ছুটে যায় আকাশের এদিক থেকে ওদিক। বুক কাঁপে। শরীর কাঁপে। বৃষ্টির শব্দ কি ভীষণ। চারদিকে হু হু করে নামছে জল। আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে। ঘোড়াটা শুধু মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

নিশ্চুপ অবস্থা ভেঙে ঘোড়াওলা বিড়বিড় করে কি যেন বলল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল - বহিনজি, উতারিয়ে।

আমি অর্থহীন চোখে ওর দিকে চেয়ে কি করব ঠিক করতে পারছি না।

- হামলোক আউর জানে নেহি সকতা, ঝুটমুট ঘোড়েকো পরিশান করনেমে কেয়া ফায়দা! আপ উতারিয়ে।

ঘোড়ার ওপর উপুড় হয়ে আস্তে আস্তে এক পা বাড়ালাম, ও আমার পায়ে রেকাব গলিয়ে দিলো, শক্ত করে ধরল আমার বাহু, সরু পথের ওপর কোনরকমে নামলাম। ভয়ে বুক দুরুদুরু।পায়ের পাশেই খাদ, গড়িয়ে যাচ্ছে জল।

ও কঠিন হাতে আমাকে পথের মাঝখানে সরিয়ে আনল। পথের ওপর দাঁড়িয়ে ব্যাগ্রভাবে পিছন ফিরে তাকালাম - চড়াই পথ জনশূন্য। বেশ কিছুটা দূরে পথের উচ্চতা শেষ তারপর হয়ত ঢালু। ওই চড়াইয়ের মাথা পর্যন্ত যদি যাওয়া যেত! আকুল হয়ে ওদিকে তাকিয়ে রইলাম।

বৃষ্টির বেগ কমে এলো।

- উধারসে ভি কোই আতা নেহি কিঁউ? - চিন্তিত ভাবে বলল সে। ফেলে

আসা পথে হঠাৎ ও ছুটতে শুরু করল। আমি কি করব বুঝতে পারলাম না,আমিও কি ওর পিছনে ছুটব? ঘোড়াটার চোখ ঢাকা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে লাগাম চিবোচ্ছে। সাবধানে পা ফেলে এগোতে চেষ্টা করলাম।

পথের উঁচু মাথায় গিয়ে ও থামল, কপালের ওপর হাত রেখে দূরে কিছু দেখতে চাইল, তারপর আস্তে আস্তে ফিরে আসতে লাগল।

- উধার ভি কুছ গড়বড় হুয়া হ্যায় - চিন্তিত ভাবে বলল সে - রাস্তমে কোই আদমি নেহি।

আমার মাথা ঘুরছে, আমি বসে পড়লাম, চোখ বুজিয়ে নিলাম।

.... মা, আমি তোমার কথা শুনিনি। তুমি বলেছিলে - তুই যদি যাবোনা বলে বেঁকে বসিস তাহলে আর যাওয়াটা হয় কি করে?.... কিন্তু আমি মায়ের কথা শুনিনি... এখন আমি কি করব? কেঁদে ভাসানো ছাড়া আমার আর কি করার আছে।

হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে নিঃশব্দে কেঁদে কেঁদে কতক্ষণ কেটে গেল জানিনা একসময় মনে হলো আমার খুব শীত লাগছে। কাঁপতে কাঁপতে চারিদিক তাকালাম। মনে হয় বেলা পড়ে আসছে, নাকি আবার মেঘ ঘনাচ্ছে? না, মেঘ নয়, বেলা শেষের মরা আলো। একটু তফাতে ঘোড়াওলা উবু হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

যদিও তার দৃষ্টির ভাব আমি তফাত থেকে বুঝতে পারলাম না তবু আমার মধ্যে শিরশির করে উঠল ভয়, কি ভাবছে ওই শক্তসমর্থ যুবক?

- মালুম হোতা হ্যায় কি উধার কা রাস্তা ভি বন্ধ হো গিয়া - ঈষৎ উঁচু গলায় বলল ও - তুমহারা আদমি উধারমে আটক পড় গয়া।

ওর কণ্ঠে কি অস্বাভাবিক কিছু ভাব? ও যদি আমাকে - ও উঠল, আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ঘোড়ার আড়ালে সরে যাবো আমি? অন্তত কিছু বাধা - আমার বুক কাঁপছিল।

- ক্যায়া হুয়া? ঠান্ডি?

- আমি ওদিকে যাবো - ফেলে আসা পথের দিকে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

- উধার যানেমে কোই ফ্যায়দা নেহি - চিন্তিত বলল সে - হামলোগকো ইধারই ঠারনা পড়েগা। হম্ উপরসে চলা যা সকতা- সে পাহাড়ের উপর দিকে তাকাল - হামারা ঘোড়াভি যা সক্ তা - ঘোড়ার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল সে, ঘোড়াও কেমন একটা আওয়াজ করল, ঘাড় দোলাল।

তাহলে? এই নির্জন অবরুদ্ধ পথে আমি কি করব? রাত আসছে, কি ভীষণ ঠাণ্ডা। গত রাতে তাঁবুর ভিতর ক্যাম্পখাটে শুয়ে সমস্ত গরম পোষাক পরে তার ওপর দূটো কম্বল গায়ে দিয়েও কাঁপুনি থামেনি। ও আমাকে ফেলে চলে যাবে?

একটু আগেও যাকে আক্রমনকারী ভাবছিলাম মনে হচ্ছে তার হাতটা আঁকড়ে ধরি। কি নেবে আমার? আমি তো কুমারী নই - কিন্তু জীবন? তাছাড়া তেমন কিছু ঘটলে আমি তো কাকুতি মিনতি করে কেঁদেকেটে ওকে আটকানোর চেষ্টা করতে পারি।

- চলে যাবে? - আমি আর্ত গলায় বললাম, উঠে দাঁড়ালাম।

- হাম্ নেহি যায়েঙ্গে - দৃঢ় গলায় বলল সে, দুপাশে মাথা নাড়ল।

আমার চোখে জল এল, দুহাতে মুখ ঢেকে আমি কান্না চাপতে চেষ্টা করলাম।

- রো মৎ, - গাঢ় গলায় বলল সে, - মৎ রো, সব ঠিক হো যায়গা।

ক্রমশঃ ছায়া নামছে, এতো শীত করছে! কোথয় যাবো আমরা? কিভাবে উদ্ধার পাবো? এটা বুঝতে পারছি রাত্রি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই

হবে। এই দীর্ঘ রাত, এই শীত, ভাবতে আমার কাঁপুনি বেড়ে গেল।

সে এপাশ ওপাশ তাকাল - ইধর বৈঠনেকা ভি জায়গা নেহি - বিড়বিড় করে বলল তারপর ঘোড়ার লাগাম ধরে সাবধানে ঘোড়াকে ঘোরাল, ফেলে আসা পথ ধরে চলল, ইসারায় আমাকে আসতে বলল।

কিছুদূর চড়াই, তারপর উৎরাই, তারপর রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। এই বাঁকের কাছে এসে থামল সে। এখানে রাস্তা সামান্য একটু চওড়া, তারপর আবার সরু হয়ে গেছে। এখানে বাঁক ঘুরতেই একটা স্বস্তি ভাব - বুঝতে পারলাম যে শিরশিরে উত্তুরে হাওয়া এতক্ষণ শরীরে বিঁধছিল বাঁক ঘুরতে পাহাড়ের আড়াল তাকে আটকে রাখছে। পাহাড়ের গা ঘেঁসে দাঁড়ালাম।

নুড়ি পাথর সরিয়ে দিয়ে সে খানিকটা জায়গা পরিস্কার করে ফেলল, আমাকে না বলতেই আমি সেখানে বসে পড়লাম। স্থানটি পুরোপুরি পাথর কেটে তৈরি, মাটি নেই, বেশ তকতকে। আমার রক্ষাকর্তা জানে পাহাড়ের গতি-প্রকৃতি, ঠিক জায়গাতেই এসেছে।

পিঠে বাঁধা ব্যাগ খুলে রাখলাম, জলের বোতল বর্ষাতি রাখলাম।

তিন দিন ধরে পথ চলছি, তিন রাত কাটিয়েছি তাঁবুর চটিতে, চতুর্থ দিনের পথ শেষে দর্শন সেরে ফিরে যাব চটিতে, সেখানে তাঁবুতে রাত্রিবাস, তাই জিনিসপত্র সবই ওখানে। আমাদের মালবাহকেরা ওখানেই আছে আমাদের অপেক্ষায়। আগামীকাল ফেরা।

সেই তাঁবুর খাট, সেই কম্বলের বিছানা, গরম জল আর খাবারের কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। আপাততঃ ব্যাগে যা আছে তার সদ্ ব্যবহার করতে মনোযোগী হলাম।

একটা মাঙ্কিক্যাপ, যেটা আজ যাত্রা শুরুর সময় মাথায় ছিল, পরে গরম লাগছিল বলে খুলে রেখেছিলাম - ওটা পরলাম। একজোড়া উলের মোজা - যা জুতোর সঙ্গে পরা অভ্যাস নেই বলে বেশির ভাগ সময় শুধু জুতো পরে কাটিয়েছি - জুতো খুলে সেদুটো পরে জুতো পরলাম। উলের একজোড়া

গ্লাভস্ - তাও পরলাম। বর্ষাতিটা গায়ে দিলে বেশ গরম লাগে - পরলাম। পাথরে হেলান দিয়ে বসে এতক্ষণে নজর গেল ওর দিকে, সত্যি, মানুষ নিজেকে নিয়েই সদা ব্যস্ত! নিজের সুখ, নিজের আনন্দ - আপনি বাঁচলে বাপের নাম! - প্রবাদ বাক্যটা এমনি এমনি দেখছি তৈরি হয়নি। নিজেকে বাঁচাতে যত সচেষ্ট আমি ততটা কি চিন্তা করছি স্বামীকে নিয়ে? মনের মধ্যে একটা ভাবনা রয়েছে বটে কিন্তু আমিতো তার চিন্তায় ভেঙে পড়েছি তাতো নয়। আর ওই লোকটি - যার ওপর আমার জীবন নির্ভর - যে ইচ্ছা করলেই চলে যেতে পারতো কিন্তু আমাকে রক্ষা করবার জন্যই কষ্টভোগ করছে তার জন্য আমি কি একটু কিছু - কিন্তু ও কি করছে? দুই তালুর মধ্যে ধরে এমন একটা ছোট চুপড়ি - বেত কিংবা বাঁশের ছিলে দিয়ে বোনা মনে হচ্ছে তার মধ্যে বসানো একটা ঘটির মতে কিছু তাতে কিছু দিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে। ওগুলি ওর ঝোলায় ছিল?

অন্ধকার একেবারে গ্রাস করে নিল চারিদিক। যদিও এই মুক্ত পরিবেশে ছায়া ছায়া সব দেখা যাচ্ছে। আলখাল্লার মতো কোট ওর গায়ে, মাথায় টুপি, আগুনের আভায় ওর মুখ জ্বলজ্বল করে উঠছে। খোঁচা খোঁচা সোনালী দাড়ি, দুর্দান্ত ফর্সা কাটাকাটা মুখে গাল দুটে শীতের প্রকোপে লাল আর ফাটা ফাটা। মোটা মোটা আঙুলের বলিষ্ঠ হাতে পাত্রটা ধরে ও ফুঁ দিয়ে আগুন তৈরি করতে চেষ্টা করছে। অদ্ভুত দৃশ্য! ঘোড়ার দিকে তাকালাম, ধবধবে সাদা রঙটা অন্ধকারেও দেখা যায়। আকাশ দেখলাম - আকাশে এত তারা আছে! ভাবা যায়! আমার ভেতর কেমন রোমাঞ্চ জাগছে! তলপেটে চাপ - এখন আর ভয়ের বা চিন্তার লেশমাত্র নেই।

আগুন ভরা পাত্রটি নিয়ে ও উঠল। পাত্রটিতে দেখছি দড়ি বাঁধা। কাছে এলো ও, আমার গলায় ওটা ঝুলিয়ে দিলো। আহ্ ভারি আরাম! হাত দুটো পাত্রের কাছে আনলাম। তলপেটে অস্বস্তি বেড়েই উঠছে। এই এক মুসকিল মেয়েদের। ঝোলা থেকে কি সব বার করে ও ঘোড়াকে খাওয়াতে লাগল,

আমি আস্তে আস্তে উঠে বাঁকের ওপাশে গেলাম।

ফিরে এসে বসলাম। একটু খিদে খিদে ভাব। যদিও তিনদিন ধরে দেখছি এই উচ্চতায় খিদে তেষ্টা ইত্যাদি প্রায় নেই। সামান্য কিছু খেয়ে সকালে পথ চলা শুরু, পথে টুকটাক খাওয়ার জন্য ব্যাগে রাখা শুকনো খাবার, এভাবেই চলছে।

আমার ব্যাগে কিছু বিস্কুট, কিসমিস্ আর খেজুর আছে। যাত্রার শুরু থেকে এই নিয়মে সাজানো হয়েছে ব্যাগ, বাকি সব মালপত্র মালবাহকের কাছে। ব্যাগের ভেতর হাত দিয়ে খাবারগুলি অনুভব করলাম। আমার রক্ষাকর্তাকে কিছু অন্ততঃ প্রতিদান দিতে পারবো ভেবে একটু তৃপ্তি পেলাম।

আবছা আলো ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে পর্বতে, উপত্যকায়। আকাশে চাঁদ উঠল। চাঁদের কথা মনেই ছিলনা। পূর্ণিমা তিথি দেখেই তো বেড়াতে বেরিয়েছি। প্রথম রাতে জোৎস্না দেখেছি ন'হাজার ফুট উচ্চতায়... সেখানে তাঁবু ছিল বিশাল বিশাল পাইন বনের মাঝখানে। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে এক খরস্রোতা নদী, পাহাড়ের ধাপে ধাপে নাচতে নাচতে ফেনার উচ্ছাস তুলে। দ্বিতীয় রাতে জোৎস্না দেখেছি চোদ্দ হাজার ফুট উচ্চতায়....সেখানে কোনো গাছপালা নেই। চারিদিকে তুষারের মুকুট পরা পাহাড় চূড়া, সামনে এক বিশাল সরোবর, তারই তীরে তাঁবুগুলি। চাঁদের আলোয় সে সরোবরের স্থির জল যেন কাচে ঢাকা এক বিশাল প্রান্তর। তৃতীয় রাতে জোৎস্নায় ভাসছিল পাঁচ দিকে পাঁচটি ধারায় বয়ে যাওয়া এক নদী, তারই তীরে তীরে তাঁবু।

জোৎস্নাময় এই তিনটি রাত ছিল স্বামীময় প্রেমময় সুখময় স্বপ্নময় রাত। আজ তুমি কোথায় আর আমি কোথায় হারিয়ে গেছি। আমিতো ভাল আছি, ভগবান নিশ্চয় তোমাকেও ভাল রেখেছেন।

কি নিস্তব্ধ রাত! ' পিন ড্রপ সাইলেন্স ' বোধহয় একেই বলে। কি আশ্চর্য

গভীর জোৎস্না! ওই উপত্যকা, ওই তুষার ঢাকা নদী - তুষারের মুকুট পরা সারিবদ্ধ পাহাড়ের পাশ দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে! কতদূর দেখা যায়...ভয় ভাবনা সব ভুলে আমি কেমন এক মুগ্ধতায় ডুবে যাচ্ছি...পৃথিবীর সুন্দরতম অলিন্দে বসে কেমন এক রোমাঞ্চ বুকের মধ্যে....

ওই অপরিচিত এক যাযাবর যুবক... তার সাদা ধবধবে পক্ষীরাজ ঘোড়া - ও আমার রক্ষাকর্তা। নাকি ধ্বংসকর্তা? - না না, মানুষটা তেমন নয়। এই শীতপাহাড়ে সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ এই উত্তাপের ভাণ্ডার - দেখো আমায় দিয়ে -

ঘোড়ার পিঠে বসার আসনে যেসব উপাদান ছিল সেগুলি সম্ভবত ছেঁড়া কম্বল টম্বল হবে, সেগুলি খুলে ঘোড়ার গায়ে যথাসম্ভব চাপা দিল তারপর হাতের তালু পরস্পর ঘষতে ঘষতে জবুথবু হয়ে বসল।

ব্যাগ থেকে কিছু খাবার বার করে ওকে কিছু দিলাম, নিজে কিছু নিলাম, ও একগাল হাসল।

রাত্রি বাড়ছে, ঘন হচ্ছে দুধের মতো জোৎস্না....যেন সর পড়ছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে...জমে উঠছে ঠাণ্ডা...ঠাণ্ডা কি আমাদের দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে ফেলে দেবে ওই খাদে? আমি দেখছি ওর কাঁপুনি। আঃ, আমার বুকের কাছে ওর হৃদপিণ্ডের উত্তাপ। আমাকে এটা দিয়ে ওর নিজের কি দুরবস্থা। আমি তো বুঝতে পারছি এই সামান্য বস্তুটার কি অসামান্য অবদান। আমার উচিত এটা ওকে ফিরিয়ে দেওয়া। বুঝছি,কিন্তু পারছি কই?

ওর কাছে সরে গেলাম, খুব কাছে, পাত্রটি দুহাতে তুলে দুজনের মাঝখানে রাখতে চেষ্টা করলাম। কি আগ্রহে যে ও শরীর ঝুঁকিয়ে দিলো! আগুনটায় দুবার ফুঁ দিয়ে বাড়িয়ে দিলো, গভীর শ্বাস নিলো উত্তাপে।

শরীর যদি গুটিয়ে নেওয়া যেত সাপের মতো! আঃ এখন কি তুষারপাত শুরু হবে? কি ভীষণ কাঁপুনি উঠে আসছে পা বেয়ে – ছড়িয়ে

পড়ছে বুকের মধ্যে - না কি বুকের ভেতর থেকে কম্পন ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে? সব ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। কান্নার গোঙানি বুক ঠেলে বেরিয়ে এল।

ঘাবড়াও মৎ, মৎ ঘাবড়াও - ফিসফিস করে বলল ও, বুঝতে পারলাম ওর কণ্ঠস্বরের অসহায়তা। ঝোলা থেকে প্যাকেট বার করে দুচার টুকরো কাঠকয়লা আগুনে দিল তারপর প্যাকেট ঝোলায় ঢুকিয়ে রাবারের ভারী বর্ষাতি বিছিয়ে নিলো দুজনের মাথার ওপর দিয়ে, বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জড়িয়ে নিলো আমাকে। এক টুকরো উত্তাপ খণ্ড মাঝখানে রেখে দুটি বুক পরস্পর মিশে আছে। আমি শিশুর মতো ওর শরীরে ঢুকে যেতে চাইলাম। ওর শরীরের ও পোষাকের বোটকা গন্ধ ঝাঁঝালো লাগছে নাকে, ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার কপালে মুখে। ঢাকার মধ্যে উত্তাপ কিছুটা স্বস্তি ছড়াচ্ছে, আমি একটু আরাম বোধ করলাম। কিন্তু ওর শরীরের বিভিন্ন স্পর্শে আমি বুঝতে পারছিলাম ওর ভেতরে ভেতরে বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে।

- হাম কুছ নেই করেগা - কাঁপা কাঁপা গলায় অসহায় ভাবে বারবার বলল সে, আমাকে? না কি নিজেকে।

- তুমি আমাকে বাঁচাবে - ওর বুকের মধ্যে মিশে যেতে যেতে বললাম আমি। বুঝতে পারলাম আমার ঘাড়ে মুখ গুঁজে ও প্রাণপণে নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করছে।

মনোজ:

মাত্র তিনমাসের জন্য উন্মুক্ত এই তীর্থক্ষেত্রের পথে প্রায় চোদ্দহাজার ফুট উচ্চতায় পথের এই অংশটি খুবই বিপজ্জনক। হিমালয়ের এই উচ্চ অংশেও মাটি আর পাথর মেশা এই পর্বতের শরীরে মাটি আর পাথরকুচিই বেশি। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে প্রতি বৎসরই এই পথে ধ্বস নামে, ভেঙে যায়। সামরিক বাহিনীর একটি উদ্ধারকারী দলকে প্রতি বছর এখানে রাখা হয়

দেবারতি জানালো - ধ্বস সরিয়ে আমাদের নামাতে দুপুর পেরিয়ে যায়, অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে পাওয়া গিয়েছিল। তারপর দ্রুত নামিয়ে আনা হয় নীচে। যে পথ আমরা তিনদিন ধরে গেছি তা
ওরা নামিয়ে এনেছে একদিনে। হাসপাতালে ভর্তি করেছে। ঘোড়াওলার হেফাজতে দেবারতি মোটামুটি সুস্থ ছিল কিন্তু আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখার পর ও এত কাতর হয়েছিল, এত কেঁদেছিল যে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

হাসপাতালের উষ্ণ আশ্রয়ে বসে দেবারতির মুখে এসব শুনতে শুনতে আমার শুধু মনে পড়ছিল সেই গভীর নৈঃশব্দ....জোৎস্না প্লাবিত নিথর প্রকৃতি.... কোথাও এতটুকু কাঁপনও নেই.. ওরা আমায় নিথর, নিস্তব্ধ করতে চাইছিল... আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ধীরে ধীরে নিঃসাড় করে দিয়ে গ্রাস করে নিতে চাইছিল জীবন। আমার ব্যাগে একটু ব্রান্ডি ছিল, সেটুকুও এত ঠাণ্ডা! তবু কোনক্রমে সেটুকু খেয়েছিলাম, তারপর আর কিছু মনে নেই।

আমাদের মালপত্র এসে গিয়েছে, ট্যাক্সি আসছে, যাবো নিকটবর্তী এরোড্রোমে। হাসপাতালের বারান্দায় অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ দেবারতি দ্রুতপায়ে নেমে গেল, দেখলাম সাদা ঘোড়াটা নিয়ে ওর ঘোড়াওয়ালা এসে দাঁড়িয়েছে। ও ছুটে গিয়ে তার কাছে দাঁড়াল, দুহাতে ওর ডানহাতটা ধরে কি যেন বলল। দীর্ঘদেহী যুবকটির সঙ্গে কথা বলতে ও মুখটি অনেকটা তুলে ধরেছে।

আমি ওর প্রতি কৃতজ্ঞ, ও না দেখলে আমি আমার দেবারতিকে ফিরে পেতাম না। আমি যাওবা অজ্ঞান হয়ে বেঁচেছিলাম দেবারতি তা পারত না। তবু কেন যে ওই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আমার মন বিরূপ হয়ে উঠেছে!

কৈফিয়ত

নমস্কার স্যার, অনেকক্ষণ হয়ে গেল আমি ভেতরে এসেছি, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার পা ব্যথা করছে, অথচ সেই যে আমাকে ভেতরে আসতে বলেই আপনি টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ই পাচ্ছেন না। একটু সময় করুন, আমাকে যা বলবার বলে চলে যেতে দিন তারপর কাজ করুন।

আসলে তা নয়, আমি জানি স্যার, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আপনার পদমর্যাদা সম্বন্ধে আমাকে সচেতন করাচ্ছেন। আমি যে নিম্ন শ্রেনীর কর্মচারী, আমি যে আপনার ভৃত্য, সেটা আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আপনি যদি সত্যি জরুরি কাজে ব্যস্ত হতেন তাহলে আমাকে মুখ তুলে একটু দেখতেন, হাতের কাজটা শেষ করে নেওয়ার জন্য একটু সময় চেয়ে নিতেন কিংবা বসতে বলতেন। এইতো আপনার টেবিলের সামনে এতগুলো চেয়ার, এগুলোতো কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসে বসবার জন্যেই।

অবশ্য আপনার হয়ত ধারণা ও চেয়ারগুলি শুধু বিশেষ পদমর্যাদার লোকেরাই বসবেন, আমার মতো যদো-মদো লোকের জন্যে নয়, কিন্তু স্যার আপনি আমাকে নাবললেও আমি নিজেই বসছি, কারণ আপনি যেমন এখানে এসেছেন উচ্চপদে চাকরি করতে আমিও তেমনি এখানে এসেছি নীচু পদে খুব সামান্য একটা কাজ করতে। কিন্তু আমরা দুজনেই এসেছি দেশের জনসাধারণের কাজ করতে। এই যে হাসপাতাল, এখানে রোজ হাজার হাজার অসুস্থ লোক একটু চিকিৎসার জন্যে সেবা শুশ্রূষা পাবার আশায়

আসছেন তাদের সেবা করার জন্য আপনি এবং আমি দুজনেই এখানে এসেছি। এই সামান্য কাজটুকু আমি আত্মসম্মান বজায় রেখে ঠিকঠাক করতে চাই। কাজে গাফিলতি করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।

কিন্তু আমি আপনার বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের দাসত্ব করতে এখানে আসিনি। আপনারা অনেক উঁচু পদে বসে এটা ভুলে যান যে আপনারাও এখানে কর্মচারী, আমিও এখানে কর্মচারী। এই বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও আপনাদের অনেকে দাসপ্রথা চালু রাখতে পারলে খুশি হন।

যাই হোক আমি নিজের ইচ্ছাতেই বসলাম। এটা বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ, একবিংশ শতাব্দী প্রায় এসে গেল, এখন যে যত নীচু পদের কাজ করুক না কেন প্রত্যেককে বসার জন্য অন্ততঃ একটা টুলও দেওয়া উচিত।

না না, এতক্ষণে আমি যখন নিজেই বসে পড়েছি তখন আর 'বোসো বোসো ' বলতে হবেনা। তাছাড়া আপনি আমাকে বোসো বোসো বলছেন কেন? বসুন বলতে পারেন না?

এটা খুবই দুঃখের কথা যে আমার মতো একজন প্রায় অশিক্ষিত মানুষকে আপনার মতো একজন উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদাসীন ব্যক্তিকে এই সামান্য ভব্যতা শেখাতে হচ্ছে।

না না, আমি আপনার ছেলের মতো - এটা পাশ কাটানো কথা। আপনি আপনার ছেলেকে তুমি কেন, তুই করেও ডাকতে পারেন, কিন্তু আমাকে আপনি বলাই উচিত।

তাছাড়া আমি আপনার ছেলের মতো কি করে হবো স্যার? আপনি আমাকে হাসালেন! টাকার অভাবে যে সামান্য স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার বেড়াটা ডিঙোতে পারেনি সে কি না আপনার ছেলের মতে! এই যে আমি সাত সকালে দুখানা বাসি রুটি আর চা খেয়ে বাসে ঝুলতে ঝুলতে হাসপাতালে চলে আসি, এসে নানা অসুখে জর্জরিত মানুষের মল মূত্র থুতু কফ এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লেগে যাই তখন নিজেকে একটা কি রকম মনে হয়

সেটা আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না।

বেশিরভাগ দিনই সকালে ভালো করে চান হয়না। হাওড়ার যে বস্তিতে আমি থাকি সেখানে তিনশ জন লোকের জন্য একটা টিউবওয়েল, তাই দুপুরে দুটোর সময় কখন এসে একটু চান করব -

যাক, আমাদের এই ভীষন সুখের নিদারুণ চিত্র আপনার কাছে আর বেশি ব্যাখ্যা করে লাভ নেই। এটুকু বললাম শুধু আপনি আমাকে আমার ছেলের সাথে তুলনা করলেন, তাই।

আপনার ছেলে সকালে ঘুম থেকে উঠে শোবার গর সংলগ্ন বিলাসবহুল বাথরুমে ঢোকে। সেখানে দামী দামী সব কত কি ব্যবহারের জিনিস থরে থরে সাজানো যা আমরা খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে দেখে দেখে সুখী হই। তারপর সকালে তার ব্রেকফাস্ট, ভিটামিন সমৃদ্ধ পাউরুটি দুধ আরেকটা কি যেন বলে - কর্নফেলেকস - মাখন, প্রোটিন সমৃদ্ধ ডিম দিয়ে। তারপর ছেলে আপনারই মতো দামী মানুষ হয়ে ওঠার জন্য সুন্দর গাড়ি চেপে কলেজ যায়। আপনার ছেলের সঙ্গে স্যার আমার তুলনা!

আমি স্যার এই বিশাল গনতান্ত্রিক দেশের একটা ছোটলোক পাড়ার এক নগন্য ছোটলোকের ছেলে যে পয়সার অভাবে স্কুলের গণ্ডি পার হতে পারেনি, বরং পয়সা উপায় করার জন্য যাকে রোজ সকালে দুটো বাসি রুটি আর এক কাপ চা খেয়ে - ছিঃ ছিঃ, আমার সঙ্গে আপনার ছেলের -

আমি এই হাসপাতালের একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী, আমি যা তাই ভাবুন। তবে হ্যাঁ, মানুষের মর্যাদা দিন, আমাকে আপনি বলে কথা বলুন। আপনিও যেমন এই বিশাল গনতান্ত্রিক দেশের একজন নাগরিক, আমিও তেমন। আপনি যেমন এই বিরাট হাসপাতালে জনসাধারণের সেবা করতে এসেছেন, আমিও তেমনি এসেছি।

আমি জানি স্যার আজ কেন আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আজ সকালে বেশ কিছুটা সময় আপনি আমাকে আমার কাজের জায়গায়

অনুপস্থিত দেখেছেন - ভুল বললাম, শুনেছেন। হ্যাঁ, কে কোথায় কি কাজ করছে, ঠিকঠাক কাজ করছে কি না এ নিয়ে আপনার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। এই স্বাধীন দেশের স্বাধীন কর্মচারী - কে কখন আসবে কখন যাবে কি করবে এ ব্যাপারে যার যার পূর্ণ স্বাধীনতা। তবে কি না সেই স্বাধীনতা ভোগ করবার জন্য আপনাদের - অর্থাৎ উপরওয়ালাদের ঠিকঠাক সেবা করে যেতে হবে।

কিন্তু সে ব্যাপারে আমার যথেষ্ট দক্ষতা নেই, আমি তা স্বীকার করছি। আমি সুষ্ঠু ভাবে আমার কাজ করতে পারি, খুবই যত্নের সঙ্গে এই সব অসহায় অসুস্থ মানুষদের সাহায্য করতে পারি, কিন্তু আপনাদের মতো উপরওয়ালাদের সেবা করতে পারিনা।

আমি জানি আপনার ব্যক্তিগত নার্সিংহোম - যেখানে সব দামী দামী মানুষদের অনেক পয়সা খরচ করে চিকিৎসা হয় সেখানে গিয়ে আমি যদি মাঝে মাঝে কাজ করে দিয়ে আসতাম, তাহলে এখানে এই গরীবগুবরোদের চিকিৎসার হাসপাতালে কখন আসি কখন যাই, কি কাজ করি না করি কেউ খবর রাখতো না। আমি যদি এখানে রুগীদের থেকে টাকা নিয়ে সুবিধা দিতাম - সে ও কেউ দেখেও দেখত না। এমনকি এখান থেকে মাল হাতসাফাই করার মতো অধিকারও আমি পেয়ে যেতাম। আর পেতাম আপনার কাছ থেকে খুব সামান্য পারিশ্রমিক - অর্থাৎ কি-না আপনার জন্য বেগার খেটে এখান থেকে উসুল করে নেবার সুযোগ। কিন্তু আমি তা পারিনি। আর সেজন্যই এসব যারা পারে তাদের ওপর আপনি ভার দিয়ে রেখেছেন আমার ওপর কড়া নজর রাখবার। তাই আপনি ঠিকঠাক শুনেছেন আমি সকালে কাজ ছেড়ে অনেকটা সময় কোথায় চলে গিয়েছিলাম। আর তাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন জবাবদিহি করার জন্য।

খুব সত্যি কথাটা কটকটিয়ে বলে ফেললাম। আপনি রাগে গসগস

করচেন বুঝতে পারছি। আমি জানি স্যার যদি এখনি আমার চাকরিটা খেয়ে নিতে পারতেন, যদি এখনই আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বার করে দিতে পারতেন, তাহলে আপনি প্রচুর আনন্দ পেতেন। হয়ত একদিন আপনি তা পারতেও পারেন। হয়ত কোনো চুরির বদনামে জড়িয়ে দিয়ে প্রমান করে দেবেন আমি চোর - সুতরাং চাকরি নট্।

অথচ আপনি আমাকে একদিন কি ভীষণ ভালবাসতে শুরু করেছিলেন। একদিন ডেকে কি মিষ্টি মিষ্টি কথায় আমার কাজের গুণগান করছিলেন। আমি একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী হয়েও যথেষ্ট মেধাবী - এরকম সব চাটুবাক্য - আসলে আপনি লক্ষ্য করেছিলেন আমি এই হাসপাতালে ল্যাবরেটরির পরীক্ষার কাজ নিজেই অনেকটা এগিয়ে দিতে পারি। তাই এত চাটুবাক্য!

ঝুলির আসল বেড়ালটা আপনি যকন বার করলেন তখনই বুঝলাম, আপনার নার্সিংহোমে গিয়ে কিছু কিছু কাজ করে দিয়ে আসতে হবে - আপনি নিঃসঙ্কোচে কথাটা বলে ফেললেন।

আপনি ভাবতেও পারেননি আমি ' রিফিউজ ' করব। আপনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। আপনি ভাবতেও পারেননি আপনাকে খুশি করবার এমন প্রশস্থ রাস্তা আমি হেলায় ফেলে দোবো।

আসলে স্যার আত্মসম্মান বোধ, সততা - যেটা এখন প্রায় দুর্লভ সেটাই আমার মধ্যে বড্ড বেশি। মেরুদণ্ডটা সোজা রেখে চলার অভ্যাসটা এতটাই আমার হাড়ে মজ্জায় মিশে আছে কি বলব!

আমি জানি স্যার, খুব চেষ্টা চলছে হয় আমাকে ঘুষ খাওয়ার কেস, নয় চুরির কেস -এ ভাল করে জড়িয়ে ফেলার। সেভাবে আমাকে এখান থেকে পিছনে লাথি মেরে যখন ছুঁড়ে ফেলা হবে, তখন এই সামান্য মাইনের চাকরিটা চলে গেলে আমাদের অভাবের সংসারটা দিশাহারা হয়ে পড়বে

তখন আমি আপনার নার্সিংহোমের দরজায় গিয়ে আপনার অনুগ্রহের জন্য আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়ব, আর তখন কি বিভৎস উল্লাসে আপনি ফেটে পড়বেন -

হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি আপনি প্রচন্ড রাগে আগুন হয়ে উঠছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার ছেঁদে বক্তৃতা শোনবার আপনার কোনো প্রয়োজন নেই - তা বলবেন বইকি! না স্যার আপনার সামনে বক্তৃতা দেবার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আমি শুধু সামান্য কিছু কথা যা এই বিশাল গণতান্ত্রিক দেশের সুন্দর উপাখ্যান - তা আপনাকে শোনাচ্ছিলাম। আর কোনো কারনে নয়, শুধু গায়ের ঝাল একটু মেটাবার জন্যে।

ধমকাচ্ছেন? সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছি বলে ধমকাচ্ছেন? আমি জানি স্যার আপনি কোন উচ্চে বাস করেন আর আমি কোন নীচে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি আমাকে কি জন্যে ডেকেছেন। আমার কাজের সময় থেকে একঘন্টা চুরি করে আমি কি করছিলাম জানেন? আমি আমার মা কে দেখতে গিয়েছিলাম। হ্যাঁ স্যার, এই গনতান্ত্রিক দেশে কারো জন্য আছে আপনাদের মতো কয়েকশ টাকা ভিজিটের ডাক্তার যাঁরা বেআইনি জেনেও বাইরে প্রাকটিস করেন, আছে আপনাদেরই নার্সিংহোম হাজার হাজার টাকার ব্যয়বহুল চিকিৎসা, আর কারো জন্যে আছে এই হাসপাতালের আউটডোর যেখানে রুগী পিছু দৈনিক বরাদ্দ - কত স্যার?

হ্যাঁ স্যার, আমার মাকেও অনেকদিন ধরে আউটডোরে চিকিৎসা চালাচ্ছিলাম। অসুখের সঙ্গ অপুষ্টি, অপুষ্টি রোগের কি চিকিৎসা করাবো স্যার? তা শেষে অনেক চেষ্টা করে মাকে ভর্তি করাতে পারলাম। কিন্তু শেষ অবস্থায় সামান্য পয়সায় কি চিকিৎসা হবে?

আমি জানি, আমার যদি অনেক টাকা থাকতো, তাহলে দামী নার্সিংহোমে দামী চিকিৎসা হতো। ওষুধ আর খাবার - খাবারের অভাবই তো এ অসুখের মূল, মা আমার সুস্থ হয়ে যেত।

আরও একটা রাস্তা আমি হেলায় হারিয়েছি স্যার, আমি যদি আপনার কথা শুনে চলতাম, যদি আপনার দাসত্ব করতাম, তাহলে আপনারই একটা ছোট্ট হুকুমে এই হাসপাতালেই আমার মা অনেক আগে ভর্তি হয়ে যেতেন, আর এই হাসপাতালের চোরা কুঠরি থেকে অনেক দামী দামী অষুধ আর খাবার মায়ের জন্য বরাদ্দ হয়ে যেত।

কিন্তু দুটোর একটাও সম্ভব হলোনা। তাই আজ সকালে আমার মা মারা গেলেন। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম।

আমি যাচ্ছি। আজকে আপনি আমাকে অনুপস্থিত করে দেবেন। আজ আমি কোনো কাজ করিনি।

স্বত্ব

প্লাটফর্মের ওপারে রূপালী রঙ করা রেলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন অস্বস্তি, যেন ঊর্ধমুখ ধাতব তীরগুলি বিঁধে ফেলতে চাইছে।

....রেলিঙের বেড়া, বেড়ার মধ্যে বন্দী, অথচ যেতে হবে। হ্যাঁ, যেতে হবে। কোথায় যেতে হবে? কোথায় যেন যাব বলে বেরিয়েছিলাম কতক্ষণ হয়ে গেল বসে আছি। তখন সূর্য ছিল মাথার ওপর। তারপর কখন সূর্য ঢলেছে, রোদ্দুর এসে পড়েছে মুখে গায়ে। চোখ ঝলসে দিচ্ছে।মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। কখন থেকে জলতেষ্টা...

.... যেতে হবে, কোথায় যেন যেন যেতে হবে.... রেলিঙের ওপারে সবুজ গাছপালা, ওখানে গেলে ছায়া, ওখানেই কি যাবো? কিন্তু রেলিঙের বেড়া। ওদিকেই কোথায় যেন চলে গেল খোকা....

....ওই সূর্য চলে গেল গাছপালার আড়ালে .... আর চোখ ঝলসায় না। কিন্তু নেমে আসছে অন্ধকার.... মাথাটা ঘুরছে....অন্ধকার....এখন কি করব আমি....

তীব্র ভয় গ্রাস করছিল মনোরমার মন ও শরীর। কেমন এক কাঁপুনি শরীরে জুড়ে, একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এলো তাঁর মুখ দিয়ে।

এপারের প্লাটফর্মে একটা সিমেন্টের বেঞ্চের একধারে বসেছিলেন মনোরমা। বেলা প্রায় এগারোটা - তখন থেকে একভাবে ছ-সাত ঘন্টা বসে আছেন তিনি। ঘন্টা দুয়েক পর থেকেই একটা অস্থিরতা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছিল, আর উদ্বেগ, কিন্তু বাহ্যিক তিনি শান্ত হয়েই বসেছিলেন। তারপর একসময় সূর্য হেলে পড়তে রোদ্দুর তাঁর মুখে গায়ে - তখন থেকে উদ্বেগ

রূপান্তরিত হচ্ছিল ভয়ে, আর এখন সূর্য ডুবে গেলে তীব্র ভয় - জলে ডোবা মানুষের মতো আঁকুপাঁকু করছিলেন তিনি, কিছু বলতে চাইছিলেন, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছিল এক আর্তস্বর, অবোধ, অর্থহীন অথচ করুণ।

সারদিন কত ট্রেন এল-গেল, কত মানুষ নামল উঠল, কত মানুষ তাঁর পাশে বসে অপেক্ষা করল, কথা বলাবলি করল, তারপর ট্রেন এলে চলে গেল - মনোরমা একইভাবে কোলের ওপর কীটস্ ব্যাগ আঁকড়ে বসেছিলেন। দেখছিলেন - কিন্তু কিছুই দেখছিলেন না। শুনছিলেন - কিন্তু কিছুই শুনছিলেন না। শুধু গভীর চিন্তা আর উদ্বেগ আর ভয়।

এখন তাঁর পাশে বসেছিলেন দুজন মহিলা ও একজন পুরুষের একটি পরিবার - স্বামী স্ত্রী ও বিবাহিতা যুবতী মেয়ে। তাঁরা নিজেদের কথায় মশগুল ছিলেন, এখন হঠাৎ পার্শ্ববর্তিনীর আর্তনাদে সচকিত হয়ে দৃষ্টিপাত ও জিজ্ঞেস - কিন্তু মনোরমা কিছুই বলতেপাছিলেন না।

ক্রমশঃ অপেক্ষারত মানুষজন কৌতুহলী হয়ে তাঁর চারপাশে - একটা ছোটখাট ভীড় জমে গেল। বৃদ্ধা মহিলার প্রতি সকলেই সহানুভূতিশীল। এক ভদ্রলাক কি ভেবে প্লাটফর্মের চায়ের দোকান থেকে ভাঁড়ে করে জল এনে দিলেন, কিন্তু মনোরমার হাত কাঁপছিল তাই ভদ্রলোক নিজেই মুখের কাছে ধরলেন, জল খাওয়ালেন।

- কি হয়েছে দিদি, অমন করছেন কেন? একটু শান্ত হোন - বললেন পাশে বসা মহিলা, বাহুতে হাত বুলিয়ে দিলেন। এই সহানুভূতিপূর্ণ কথায় মনোরমার চোখে জল এসে গেল, হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

- কি হয়েছে বলুন -

- আমার ছেলে - বাবুল -

- হ্যাঁ হ্যাঁ, কি হয়েছে বাবুলের?

- কোথায় চলে গেছে।

- কখন?

- সেই তখন, বেলা এগারোটা হবে।

- কত বড় ছেলে?

- বড়, তিরিশ বত্রিশ -

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। অনেকে ভাবতে শুরু করেছিল ছোট ছেলে, যদিও মহিলার বয়স ষাট সত্তর বলেই মনে হয়, এবং বিধবা।

তখন একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল, ভিড়ের কিছু লোক চলে গেল, ওই পরিবারটিও চলে গেল। সন্ধ্যার লোকাল ট্রেন, অনেক লোকের নামা, তাদের কয়েকজন আবার এসে জুটল, টুকরো টুকরো প্রশ্ন, উত্তর -

সেই সাতসকালে তিনি ছেলের সঙ্গে বেরিয়েছেন, একটু ভাতেভাত পেটে পড়েছিল, তারপর সাইকেল রিক্সায় স্টেশন - না তিনি স্টেশনের নাম জানেন না। ট্রেনে কলকাতা - বাস - বাসে করে আবার এক স্টেশন, আবার ট্রেন - তারপর এখানে।

এখানে কোনো বৃদ্ধাশ্রমে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করেছে নাকি ছেলে, কিন্তু দেখে আসছি বলে সেই যে চলে গেছে -

.....যে জায়গায় ছেলের ফ্ল্যাটে সে জায়গার নাম নবপল্লী। সব বাড়িই নতুন সেখানে, সুন্দর সোজা সোজা রাস্তা, দুপাশে গাছ....কোথায় সেই নবপল্লী জানা নেই...

ছেলের আমার কি হলো? কোথায় গেল? কোনো অঘটন ঘটেনিতো? তোমরা একটু দেখোনা বাবা - কাতর গলায় বললেন।

- কি আর দুর্ঘটনা ঘটবে এখানে! স্টেশনের বাইরে ওই তো গ্রামের রাস্তা, না আছে লরী, না আছে বাস, আছে শুধু সাইকেল রিক্সা।

- এখানে আবার বৃদ্ধাশ্রম কোথায় মন্ডলদা?

- তাই তো, বৃদ্ধাশ্রমও নেই শিশু আশ্রমও নেই। আশ্রম বলতে আছে তো সেই খালপারে পাগলাবাবার আশ্রম, তা সে নামেই আশ্রম, আসলে একটা

ভাঙা কুঁড়ে!

- আরে দূর দূর, ওখানে থাকেতো আধপাগলা সাধু আর তার দুটো চ্যালা, দিনরাত গাঁজা টানে।

শুনতে শুনতে মনোরমা উদ্বেগে আকুল - আপনারা ঠিক জানেন এখানে কোনো বৃদ্ধাশ্রম নেই?

- জানবো না? এখানে জন্ম থেকে বুড়ো হয়ে গেলুম!

- এ কেস খুব গন্ডগোলের মন্ডলদা, মনে হচ্ছে বুড়িকে ফেলে ছেলে পালিয়েছে!

স্তম্ভিত মনোরমার শরীর বেয়ে হিমস্রোত, কুলকুলিয়ে ঘাম, মাথার মধ্যে ঝনঝন করে ওঠে যন্ত্রণা, যেন কেউ হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। চোখ বুজিয়ে ফেলেন।

ধীরে ধীরে সরে যায় ভীড়। ট্রেন আসে ট্রেন যায়, যারা নেমেছিল তারা চলে যায় আপন পথে, যারা অপেক্ষায় ছিল তারা উঠে পড়ে ট্রেনে।

.... হুগলি জেলার কলাছড়া গ্রামে তাঁর বাপের বাড়ির অদূরে ছিল ইস্টিশন। ছোট রেলগাড়ি, বাঁশি বাজিয়ে আসত, যেত, দাঁড়াত। তাদের একতলা বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যেত। বাবা সকাল সাতটায় ভাত খেয়ে রোজ সেই গাড়িতে চেপে অফিস যেতেন। তখন মনে হতো বাবা কি ভাগ্যবান, রোজ রেলগাড়ি চাপেন। তারপর একদিন ঠাকুমার সঙ্গে সেই গাড়িতে চেপে গঙ্গা স্নানে যাওয়া....সেই প্রথম রেলগাড়ি চাপার কি যে আনন্দ!

মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে ঠাকুমার খিটিমিটি লাগত। খিটিমিটি শুরু করতেন ঠাকুমাই। মাঝে মাঝে তাঁর মনে ব্যথা উঠত - একটা নাতি নেই! গর্ভাবস্তায় নাকি মায়ের সন্তান নষ্ট হয়ে যেত; এভাবে কয়েকটি নষ্ট হওয়ার পর অনেক ঠাকুর দেবতা কবচ মাদুলি করে তবে নাকি মনোরমা - বাবা মা

ঠাকুমার নয়নের মনি! তাঁদের মনে সর্বদাই শঙ্কা আর ঠাকুর দেবতাদের পায়ে মাথা খোঁড়া - জন্মাল যখন এটুকু যেন টিকে থাকে। অনেক বড়বেলা পর্যন্ত মা তাকে নিয়ে যেতেন বিশালাক্ষীর মন্দিরে, পুজো দিতেন, প্রার্থনা করতেন।

ঠাকুমাও তাকে খুবই ভালবাসতেন, তবু মাঝে মাঝে গজগজ করতেন - একটা ছেলে পেটে ধরতে পারলনা, কপালে আমর এমন বউ জুটল, ভিটেয় বাতি দিতে কেউ থাকবেনা গা! - এই নিয়ে লেগে যেত খিটিমিটি। খুব রেগে গেলে মা বলতেন - ফলন্ত মেয়ে দেখে ছেলের আরেকটা বিয়ে দিন, বছর বছর একটা করে বিয়োবে। - এই রকম কথা কাটাকাটি চলত সারাদিন। রান্না ভাত তরকারি পড়ে থাকত। ঠাকুমা বলতেন - আসুক সন্তোষ, এর একটা বিহিত করুক, তবে আমি জলগ্রহণ করব, নইলে আমি কাশী চলে যাব, ওই তো সামনে কাশীর রাস্তা পড়ে রয়েছে, হেঁটে হেঁটে ঠিক পৌঁছে যাব বাবার চরণে।

অথচ বালিকা মনোরমাকে ঘরের কোন থেকে টেনে বার করে ঠিক খাইয়ে দিতেন। যদিও মনোরমার খেতে ইচ্ছা করত না, খালি কান্না পেত। তারপর বাবা ফিরলে দুজনেরই অভিযোগ, কান্নাকাটি, বাবা একবার একে সামলান, একবার ওকে, অনেক কষ্টে সব শান্ত হতো। বাবা তখন মনোরমাকে কাছে ডেকে আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে ঠাকুমার কোলে বসিয়ে দিতেন, বলতেন - এমন দুগ্গা প্রতিমার মতো নাতনি, তোমার আবার দুঃখ কেন? ঠাকুমা কোনো কথা বলতেন না, সস্নেহে তাকে বুকে চেপে ধরতেন।

রাত্রে ঠাকুমার কাছে শুয়ে সে কৌতুহলের প্রশ্নটা তুলত - আচ্ছা ঠাকুমা, ইস্টিশানের সামনে দিয়ে ওই যে বড় রাস্তা ওটা কি সত্যি সত্যি কাশী চলে গেছে? ঠাকুমা বলতেন - হ্যাঁ রে, ওটার নাম তো বেনারস রোড, বেনারস মানে বারানসী - বাবা শিবের থান - কাশী। মনোরমা জিজ্ঞেস করত - হেঁটে গেলে কতদিন লাগবে? ঠাকুমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতেন

- কি জানি! -

- তুমি সত্যি সত্যি একদিন কাশী চলে যাবে ঠাকুমা?

- ওরে না রে না, এমন সোনার পুতলিকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

তীব্র হর্ন বাজিয়ে ঢুকল একটা ট্রেন, তার আলো ছড়িয়ে পড়ল। কোনো এক গভীর স্বপ্ন থেকে চমকে জেগে উঠলেন মনোরমা - এই বৃদ্ধা নাকি সেই বালিকা? বালিকা হয়ে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন বাবা মা ঠাকুমার কোলের কাছে। আদরের সেই সোনার পুতলি আজ আশ্রয়হীন। সেই ছোট রেলগাড়ীর জগতে আর ফেরা যাবেনা। ফেরা যাবেনা সেই জন্ম ভিটেতেও। সেখানে পড়ে আছে ভগ্নস্তূপ। ঠাকুমার আশঙ্কা সত্যি - আজ আর সেখানে বাতি দেবার কেউ নেই।

প্রথম মটরগাড়ি চাপার দিনটি ছিল জীবনে সবচেয়ে কান্নার দিন। সে কী কান্না, সে কী কষ্ট! একটি অপরিচিত ছেলের সঙ্গে আঁচলের খুঁট বাঁধা, সঙ্গে আরও ধুচারজন অপরিচিত মানুষ, তারা বন্দী করে নিয়ে চলছে কোন নির্বাসনে? বাবা মা ঠাকুমা তাঁরাও তো কেঁদে ভাসাচ্ছে। তবে কেন নিয়ে যেতে দিচ্ছে তাকে? কেন বাধা দিচ্ছে না? বাবা বরং সেই ছেলেটির হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলছে - আমাদের বড় আদরের বড় ভালবাসার পুতলীকে তোমার হাতে চিরদিনের মতো তুলে দিলাম, ও যেন ভাল থাকে।

কি আশ্চর্য! কান্না দেখতে দেখতে সেই ছেলেটিরও কেমন কান্না ভেজা গলা - আপনি ভাববেন না -

সেই কণ্ঠস্বর শুনে বুকভাঙা কষ্টের মধ্যেও না তাকিয়ে থাকা যায়! চোখ তুলে তাকিয়ে থাকা আর চোখাচোখি - আর সেই মুহূর্তে অপরিচিত মানুষটিকে কেমন আপন আপন মনে হওয়া, কেমন নির্ভরশীল।

তারপর ফুলসজ্জার রাতে প্রথম সম্বোধন - পুতলী!

এই ডাকনাম ধরে কতজন কতভাবে ডেকেছে তাকে, কিন্তু ডাকনাম

শুনে বুকের মধ্যে এমন তরঙ্গ উথলে উঠেছে কবে?

উত্তর কোলকাতার আঠারো নম্বর নবীন মল্লিক স্ট্রীটের মিত্তির বাড়ি - বিরাট বাড়ি, কিন্তু নানা শরিকে ভাগ হয়ে ভেতরে ছোট ছোট অংশ। দোতলার একখানা ঘর আর সংলগ্ন বারান্দা নিয়ে মনোরমার সংসার। রান্নাঘরটর সব একতলায়। এপাশে বাড়ি ওপাশে বাড়ি সামনে বাড়ি পিছনে বাড়ি - চারিদিক থেকে সব চেপে ধরতে আসছে। গ্রামের সেই খোলামেলা সবুজ পরিবেশ থেকে ধরে আনা একটা পাখি যেন খাঁচার মধ্যে। যদিও পুরোনে আমলের বড় ঘর চওড়া বারান্দা -তবু! কিন্তু স্বজন আর পরিবেশ ছেড়ে আসা বালিকা হৃদয়ের সব শূণ্যতা গভীর ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিল সেই নরম মনের মানুষটি, সে তার কথা রেখেছিল, সারা জীবন একটি দিনের জন্যেও কষ্ট দেয়নি।

আর এখন তিনি এক বাঁধানো ছবি হয়ে রয়েছেন এই ব্যাগের মধ্যে। এই সম্পদ সযত্নে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন মনোরমা। দেখতে দেখতে পাঁচ বছর হয়ে গেল পুতলী ডাক শোনেননি। ভাল নামটা কি তাঁর মনে ছিল! রিটায়ার হয়ে টাকাকড়ি যখন মাসিক আয় প্রকল্পে রাখতে মনোরমাকে সঙ্গে নিয়ে ডাকঘরে গেলেন সেদিন নাম লিখতে গিয়ে কলম থেমে গেল, মনে করে তরে লিখলেন। সেদিন ডাকঘরের সব কাজ মিটিয়ে বড় তৃপ্তির হাসি হেসেছিলেন, বলেছিলেন - আমার অবর্তমানে তোমার কোনো অভাব হবেনা। খোকা যদি না-ও দেখে –

এসব কথা তুমি বলতে পারছ? তুমি থাকবে না, খোকা দেখবে না - চাই না, আমি কিচ্ছু চাইনা, আমি শুধু তোমার আগে মরতে চাই - বলতে বলতে চোখে জল এসেছিল।

কি নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু ঝিঁ ঝিঁর ডাক। এপাশে ওপাশে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে ল্যাম্পপোস্ট। কেউ কোথাও নেই। এই ব্যাগের মধ্যেতো আছে সেই

পাশবই.... কিন্ত না, সে পাশবই মূল্যহীন, ছেঁড়া। মেয়াদ শেষে সব টাকা উঠিয়ে নেওয়া বাতিল পাশবই... কিন্তু এই মূল্যহীন বইটা আমার কাছে অমূল্য। এই বইতে ওর নাম লেখা আছে, সই আছে, নিজ হাতে লেখা সই.... ভবিষ্যতের নিশ্চিত অন্নসংস্থান করে দিয়েছিলেন তিনি, কিন্তু...

কেমন এক আচ্ছন্ন অর্ধ-অচেতন ঘোর ঘোর ভাব। মনের মধ্যে আসে যায় টুকরে টুকরো কথা, ছবি। জীবনে কষ্টের দিন বলতে সেই তো - খোকা হওয়ার সময়। এই সন্তানকে পৃথিবীতে আনার জন্য জীবনপণ করতে হয়েছিল তাঁকে। ডাক্তাররা বলেছিলেন মা কিংবা শিশু একজন থাকবে। উনি বলেছিলেন - সন্তান চাই না, কিন্তু অত কষ্টের মধ্যে অচেতন হয়ে যেতে যেতেও তিনি বলেছিলেন - আমার সন্তান থাক...

যাই হোক, মা ও সন্তান দুজনেই বেঁচেছিল। তারপর দীর্ঘ অসুস্থতা। কিন্তু সে সময় নিজের কষ্টের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছিল ওনার কষ্ট। সামান্য খাওয়া, সামান্য ঘুম, মুখের হাসি মুছে গেছে, দুশ্চিন্তার গাঢ় কালিমা মুখে শরীরে। কী গভীর ভালবাসায় মমতায় যত্নে সারিয়ে তুলেছিলেন মনোরমাকে।

তারপর সেই মধুপুর বেড়াতে যাওয়া.... কী মধুর স্মৃতি....সারা দিন রাত সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকা - সঙ্গে ফুটফুটে খোকা - তার হাসি তার কান্না, তার নাওয়া খাওয়া ঘুম, তার খেলা - সব-স-ব কী মধুর! একটি জীবন্ত পুতুল - তাকে নিয়ে ব্যস্ততায় আর খেলায় কেটে যায় দিন। বিকালে বেড়াতে যাওয়া - মন্থর পায়ে হেঁটে হেঁটে হারিয়ে যাওয়া প্রকৃতির কোলে। রাতে শুয়ে শুয়ে কত এলোমেলো গল্প....কোনো কাজ কি করতে দিতেন? একজন দেহাতী বউ সব কাজ করে দিয়ে যেত, রান্নাটি পর্যন্ত! একমাসে কী সুন্দর চেহারা হয়েছিল মনোরমার! প্রায় দেড়মাস থাকা হয়েছিল মধুপুরে।

সেই খোকা! কত আদরের খোকা। উনি বলতেন - আর না, যেভাবে হারাতে হারাতে তোমাকে ফিরে পেয়েছি!

তারপর খোকার একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠা। উভয়ের কত যত্নে, কত কষ্টে - শৈশব, কৈশোর, যৌবন - কত দীর্ঘ সময় পার করে....

ছেলের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত পোষ্ট অফিসের ওই টাকা নিয়ে। ছেলের ইচ্ছা কলকাতায় না হোক কলকাতার গায়ে কোথাও একটা ছোটখাট ফ্ল্যাট কিনলে ভালভাবে থাকা যাবে। কিন্তু বাবার গাঁইগুঁই - ওই কটা টাকা সম্বল, ওটুকু খরচ করে ফেলব? তার চেয়ে এইতো চওড়া বারান্দা, একে ঘিরে দিব্যি একটা ছোটখাটো ঘর হয়ে যায়। ওইতো মেজদারা তাদের অংশের বারান্দায় কেমন ঘর করেছে। ওই ছোট ঘরে আমরা বুড়োবুড়ি থাকব, তুই বিয়ে করে বড় ঘরেই থাকবি। টাকাটাও হাতে থাকবে।

- কিন্তু আমিতে এখন চাকরি করছি, উন্নতিও সামনে, সেজন্য আমি আরও পড়াশোনা আর পরিশ্রম সবই করছি, তবে আর ভাবনা কেন?

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর স্বগতোক্তির মতো বলেছিলেন - কি জানি, নিজের হাত খালি করতে মন সায় দেয় না।

- ঠিক আছে, বারান্দায় ঘর করার কথা তোমায় ভাবতে হবেনা, আমি দেখছি কি করা যায়।

- কিন্তু তোর বিয়েটা?

- ও নিয়ে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না, আমি নিজেই জানাব।

তিন জনের পরিবারে দুটো পক্ষ হয়ে গেল। এর কিছুদিন পরে মৃদুভাষী শান্ত মানুষটি শান্তভাবেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন - মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ।

বছর খানেক পর ছেলে একদিন রেজিষ্ট্রী ম্যারেজ করল। মাকে জানিয়েই করল। কোনো অনুষ্টান জাঁকজমক, নিমন্ত্রণ কিচ্ছু নয়। সন্ধ্যাবেলা বউকে সঙ্গে নিয়ে এসে প্রণাম করল মাকে। অন্যান্য শরিকদের কাছে গিয়ে যে গুরুজনদের প্রণাম করবে বা ছোটদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে - সেসব কিছুই নয়। যদিও শরিকদের সঙ্গে মুখদেখাদেখি বন্ধ তাও নয়।

বউ দেখতে ভালই, কিন্তু কেমন যেন পাথর পাথর মুখ। মনোরমা তাঁর

পুরোনো আমলের ভারী হারছড়া আর মকরমুখো বালা জোড়া পরিয়ে বউকে আশীর্ব্বাদ করলেন, বললেন - এসব পুরোনো দিনের জিনিস, তুমি এসব ভেঙে হাল ফ্যাশনের জিনিস গড়িয়ে নিও। বউমার ভাবলেশহীন মুখে তখন একটু হাসি ফুটল।

কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে গেল ওরা। কোথায় বাড়ি, মা বাবার পরিচয়, কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারলেন না মনোরমা, এমনই নিথর ব্যবহার। বউকে বাপের বাড়ি রেখে ফিরে এল ছেলে, তখন মনোরমা খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, অন্ততঃ এবাড়ির শরিকদের নিয়ে একটা ছোটখাটো অনুষ্ঠান -

- ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কিনতে হচ্ছে, মাসে মাসে মোটাটাকা ইনস্টলমেন্ট দিতে হবে, এ অবস্থায় শুধু শুধু চাট্টি লোক খাইয়ে ফালতু টাকা খরচ করার কোনে মানে হয়না - খরখরে গলায় বলল ছেলে।

এরপর মাঝেমাঝেই ছেলে বলতে লাগল - এমন বড়সড় ঘরে তোমার থাকা অভ্যাস, ফ্ল্যাটের ছোট জায়গায় তুমি থাকতে পারবে না। তাছাড়া এমন ঘর ছেড়ে যাবারই বা দরকার কি, তুমি বরং এখানেই থাকবে আমি ফ্ল্যাটে থাকব। মাঝে মাঝে দু একদিন যাবে, আমরাও আসব, সেই ভাল হবে।

.... বুকের মধ্যে কোথায় যেন সরে যায় স্তর....ভুমিকম্পে ওলটপালট হয়ে যায় ভুবন....অতঃপর পড়ে থাকে ধ্বংসস্তূপ। এই ঘরে একার জীবন যেন ধ্বংসস্তূপের জীবন.... নিজের জন্য সামান্য রান্নাটুকুও করতে ইচ্ছা যায় না। দুপুরে যদিবা কিছু করেন রাতে কোন কোন দিন মুড়ি খেয়েই কাটে।

একদিন ছেলে ফ্ল্যাট দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল - ছেলে বউয়ের সংসার, তাও ঘন্টা দুয়েক থাকা। তারপর আর একবার - নাতির জন্মের পর। ক বছরে এই তাঁর ছেলের বাড়ি যাওয়া! ছেলে অবশ্য মাস পয়লায় ঠিকঠাক আসতো, মাকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পোস্টঅফিস যাওয়া, টাকা তোলা, তারপর অফিস চলে যেত। অনেকটা টাকাই নিয়ে যেত ছেলে।

পোষ্টঅপিস থেকে ফেরার সময় একাই ফিরতেন মনোরমা। পাড়ার

মুদির দোকানে একটু দাঁড়াতেন, টাকা দিতেন, ফর্দ, অনেক দিনের চেনা পুরোনো দোকানদার, ছেলেকে দিয়ে জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিত। পাড়ারই একটি ছেলে পাড়ারই একটা রোয়াকে আনাজপাতি বিক্রি করে, তার কাছ থেকে এক একদিন কিছু কিনে আনতেন - এভাবেই চলছিল।

একদিন কিন্তু ছেলে হঠাৎ এলো, সেদিন রবিবার, সকালের দিকেই এলো, বলল এখানে খাবে, অনেকদিন মায়ের হাতের রান্না খায়নি। বাজারও করে নিয়ে এলো। সে যে কি আনন্দ!

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে মাকে বলল - ভাবছি তোমাকে ফ্ল্যাটেই নিয়ে যাবো। অনেকদিন একাএকা থাকলে, এবার নাতিকে নিয়ে একসঙ্গেই থাকো। শুনে নিজের কানে যেন বিশ্বাস হয়না! আনন্দশিহর কতদিন কত দীর্ঘদিন শিহরিত করেনি বুক।

- কিন্তু ঘরটা কি হবে? - বললেন মনোরমা।

- ছোটকাকা বলছিল ঘরটা লেখাপড়া করে দিলে টাকা দেবে, দর দস্তুর করে দিয়ে দোবো ভাবছি।

সুখদুঃখের স্মৃতি বিজড়িত নীড়, তাকে ছেড়ে চলে যাওয়া, হাহাকারে ভরে যায় বুক।

- এসব কি হবেরে খোকা? এতসব জিনিসপত্র?

- ওসব তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, তুমি শুধু তোমার দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে নাও, তোমার জামাকাপড়, পোষ্টঅফিসের বই, গয়নাগাটি -

এসবই নিয়েছিলেন মনোরমা, আর নিয়েছিলেন স্বামীর ফটো, বাঁধানো, বড় অদরকারি জিনিস, তাই লুকিয়ে নিয়েছিলেন জামা-কাপড়ের মধ্যে। অতঃপর ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটে এসে তাঁর শোবার ব্যবস্থা হলো বসার জন্য যে অংশ সেখানে সোফাকাম বেড-এ। রাতে সে বেড খোলা হয়, ভালই বড়সড়। কিন্তু দুপুরে একটু গড়ানো অভ্যাস চিরকালের, তখন বিছানা সোফা হয়ে

গেছে। ওতেই কোনোরকম একটু শুয়ে নেন। বউমার সঙ্গে কোনোকালেই মেলামেশা হয়নি, আর ব্যবহারও আড়োআড়ো ছাড়োছাড়ো। নাতিটাকেও মিশতে দিতে চায় না।

প্রত্যেক মাসে একবার করে মাকে দিয়ে টাকা তোলার স্লিপ সই করায় ছেলে - প্রতিনিধিকে অথারাইজ করার স্লিপ। টাকা তুলে এনে কিন্তু মায়ের হাতে দেয়না। একবারই বলে দিয়েছে - তোমার যখন যা দরকার হবে বলবে। কিন্তু মনোরমার কি বা দরকার!

ইতিমধ্যে একবার ফ্লু হলো মনোরমার। পাঁচ-ছ দিন ধরে জ্বর আর প্রচন্ড মাথার যন্ত্রণা। সোফার বেড আর সোফা করা যায় না। এর মধ্যে একদিন বউমার বাপের বাড়ির লোকজন আসার কথা ছিল, টেলিফোনে তাদের আসতে বারন করল বউমা। মুখখানা হাঁড়ি হয়ে যায় তার। অস্ফুটে গজগজ করে কি যেন মন্তব্যও করল।মনোরমা সঙ্কুচিত।

পোস্টঅফিসের মাসিক আয়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল, ওটা আর রিনিউ করতে চাইল না ছেলে, বলল - প্রত্যেক মাসে একবার করে যেতে হয়, একবেলা লেগে যায় টাকাটা তুলতে, বরং এখানের কোনো পোস্টঅফিসে করা যাবে। বোনাস সমেত চেক এ টাকাটা ফেরৎ দিল পোস্ট অফিস।

এখানের ব্যাঙ্কে একটা জয়েন্ট একাউন্ট করা হলো - বাবুল মিত্র ও মনোরমা মিত্র নামে। চেক জমা হলো, কিন্তু পোস্টঅফিসে আর ঢুকল না। মনোরমা দু একবার বললেন, করছি করব বলে ছেলে কাটান দিলো। আর একদিন বলতে গেলে এমন ধমক দিলো!

এরপর থেকে নানান খিটিমিটি বউমার। তুচ্ছ কোনো ব্যাপারকে বিশাল করে তোলা, চেঁচামেচি। ছেলেকে কি বলবেন, সামান্য কিছু বলতে গেলেই এত কথা শোনায়। বাচ্ছাটাকেও কাছে ঘেঁষতে দেয় না। জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। রাতে একা ঘুমহীন, কাঁদেন নিঃশব্দে।

অতঃপর ছেলে তাঁকে জানায় বৃদ্ধাশ্রমের কথা। তাঁরও মনে হয় সেই ভালো, এই অশান্তি থেকে মুক্তি।

এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে, উড়ছে ধুলো, কুটিমাটি, শুকনো পাতা, ছেঁড়া প্লাস্টিক, গায়ে এসে পড়ছে। কিন্তু এসবে কিছুই হচ্ছিল না তাঁর। কেমন এক অবোধ আচ্ছন্ন ভাব তাঁকে গ্রাস করছিল। ক্ষুধা তৃষ্ণার কাতরতা, মাথার যন্ত্রণা সবকিছু মিলে মিশে তিনি ক্রমশ আচ্ছন্নতা থেকে অচেতনতার দিকে হারিয়ে যেতে যেতে কীটস ব্যাগটাকে আঁকড়ে ধরছিলেন, আঙুল গুলি কাঁপছিল তাঁর।

রাত্রি সাড়ে দশটা, ইন্দ্রনীল অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে। স্ত্রী রমা ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল, বলল - খাবার দিয়েছি এসো।

ইন্দ্রনীল কোনো সাড়া দিল না, কাছে এসে রমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল - কী হলো তোমার? অফিস থেকে ফিরে পর্যন্ত ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছ? চা ও খেলেনা -

- না, কিছু না - বলল ইন্দ্রনীল, উঠে এসে বসল খাবার টেবিলে। একমাত্র মেয়ে নিয়ে তিনজনের সংসার তার, তিনজনেই একসাথে বসে রাতের খাওয়া হয়। মেয়ে সবে কলেজে ঢুকেছে, সেও বাবার চিন্তিত মুখ দেখে অবাক হলো।

খাবারের থালা নিয়ে কিন্তু খেতে পারছিল না সে, খাবার নাড়াচাড়া করছিল। স্ত্রী ও মেয়ে অবাক তাকিয়েছিল।

- আজ অফিস থেকে ফেরার সময় স্টেশনে নেমে দেখি এক বৃদ্ধা প্লাটফর্মের বেঞ্চে বসে কাঁদছেন। কিছু লোকজন চারপাশে জিজ্ঞেস করছে। দেখে মনে হলো সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিধবা। আলোচনা শুনে মনে হলো ওঁর ছেলে না-কি

ওঁকে বৃদ্ধাশ্রমে নিয়ে যাবে বলে বাড়ি থেকে নিয়ে বেরিয়ে এখানে এসে বসিয়ে রেখে চলে গেছে, বলে গেছে খোঁজ নিয়ে আসছি। তা নাকি সেই দুপুর বেলা। মহিলার নুখটা এমন শুকনো! আমি চায়ের দোকান থেকে একটু জল নিয়ে খাওয়ালুম।কিন্তু আমাদের এই গ্রাম এলাকায় তো কোনো বৃদ্ধাশ্রম নেই।

- তাহলে কোথায় গেল? - রমা বলল।

- আচ্ছা, এমন হতে পারে কি, ছেলে মাকে ভুলিয়ে ফেলে রেখে চলে গেছে?

-ধ্যাৎ, তাই কখনো হয়? - বলল মেয়ে।

- না না, এ হতে পারেনা - রমা।

- কি জানি, আমার কিন্তু সেই কান্নামাখা অসহায় মুখটা বারবার মনে পড়ছে।

একটু ইতঃস্তত করে উঠে পড়ল ইন্দ্রনীল, বলল, তোমরা বসো, আমি স্টেশন থেকে একটু ঘুরে আসি।

ফাঁকা স্টেশন চত্বর, শুধু প্লাটফর্মের এ প্রান্তে একটি ভিখারি পরিরার ইটের উনুনে রান্নায় ব্যস্ত - একটি পুরুষ একজন মহিলা ও দুটো ছেলেমেয়ে। এগিয়ে গেল ইন্দ্রনীল, ওই তো দূরের সেই বেঞ্চ কে যেন - কাছে এসে দাঁড়াল সে। ব্যাগ টা কোলের কাছে নিয়ে গুটিশুটি একটা দলা পাকানো মানুষ, শুকনো মুখে অশ্রুর দাগ, ঘুমিয়ে নাকি অচেতন?

- শুনছেন - ডাকল ইন্দ্রনীল, সাড়া নেই। নীচু হয়ে আরেকটু জোরে ডাকল - না, সাড়া নেই। বাহু ধরে নাড়া দিল, প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে জোরে।

কোন এক সুদুর জগৎ থেকে যেন সাড়া এল - আঁ - একটু চোখ মেললেন, নিজেকে আরও গুটিয়ে নিয়ে বেঞ্চের কোনে সরে যেতে চাইলেন। আতঙ্কিত চোখ, ঠোঁট কাঁপছে।

- আসুন আমার সঙ্গে।

ঠিক বুঝতে পারেন না মনোরমা, শরীরে কোনো শক্তি নেই, ভয়ে আরও গুটিয়ে যেতে চাইলেন।

- ভয় নেই - স্নেহার্দ স্বরে বলল ইন্দ্রনীল - আসুন, আজ রাতটার মতো অন্ততঃ আমার বাড়িতে আশ্রয় নিন, আমার স্ত্রী আমার মেয়ে আপনাকে যত্ন করে রাখবে - হাত বাড়িয়ে দেয় সে।

কম্পিত দুহাতে বাড়ানো হাতটি আঁকড়ে ধরলেন মনেরমা, বেঞ্চ থেকে নেমে দাঁড়াতে গেলেন, কিন্তু পারেলেন না, কাঁপতে কাঁপতে ধুলোয় বসে পড়লেন।

- ভয় নেই, ভয় নেই, - অস্ফুটে বলল ইন্দ্রনীল, ব্যাগটা তুলে নিয়ে কাঁধে ঝোলাল, তারপর দুহাতে শক্ত করে ওনার দুবাহু ধরে বলল - উঠুন, দাঁড়ান।

ইন্দ্রর শক্ত হাত দুটি কম্পিত হাতে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন মনোরমা।

বৃক্ষসাধ

প্রায়শই স্বপ্নের মধ্যে বিষন্ন সেই বৃক্ষ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয় । তার উর্দ্ধমুখী শাখাপ্রশাখা পত্ররাজি ধীরে নুয়ে পড়ে, যেন স্পর্শ অভিলাষী।

সেই বিশাল বৃক্ষ বড় ক্লান্ত যেন। উর্দ্ধমুখী শাখাপ্রশাখা তার পরিশ্রান্ত বাহুর মতো। ধীরে নুয়ে পড়ে। পত্ররাশি নিদ্রাতুর চক্ষুর মতো বুজে যায়। ক্রমশঃ সেই বিশাল বৃক্ষ দাঁড়াতে অপারগ যেন এভাবে ভূমিশয্যা চায় তাই বিশাল শরীর নিয়ে অতি ধীরে শুয়ে পড়ে মাটির ওপর - না - তাঁর বুকের ওপর ভেঙে পড়ে সেই বৃক্ষ, ভেঙে পড়ে, তার বুক চেপে ধরে, শ্বাসকষ্ট এবং যন্ত্রণা - যেন বুক ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চায়। তখন তিনি ভীষণ ছটফট করেন, কাকে যেন ডাকতে চান, কি যেন বলতে চান, কিন্তু কিছুই পারেন না, এবং এভাবে ছটফট করতে করতে ঘুম ভেঙে যায়।

সহসা ঘুম ভাঙলে তিনি খুব শান্ত হয়ে শুয়ে থাকেন। সামান্য একটু নড়াচড়া কিংবা কথাবলা নয় বা কাউকে ডাকার সেই আকুলতা সব সরে যায়। বিশাল ভার বুক থেকে নেমে গেছে - এই নিশ্চিত অনুভব তাঁকে গভীর প্রশান্তিতে নিয়ে যায়। যদিও ভয়ংকর এই স্বপ্নের মাঝে তিনি ভীষণ ঘেমে ওঠেন কিন্তু জাগরণে সমস্ত শরীর জুড়ে সেই আর্দ্র শীতল স্বাদ তাঁকে আরও শান্তি দেয়।

এই স্বপ্ন ঠিক ভোরের দিকে আসে। যখন স্বপ্ন সরে যায় ঘুম ভেঙে যায় তখন শান্ত শুয়ে তিনি দূরে অদূরে দু একটি পাখির কাকলি শোনেন, রাস্তা দিয়ে কচিৎ কোনদিন কেউ কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে যায়,

সেই কথার মৃদু শব্দ ভেসে আসে - তিনি কান পেতে শোনেন, পায়ের দিকের জানালায় এক টুকরো আকাশ - আলোর আভাসে ক্রমশঃ দৃশ্যমান - তাকিয়ে থাকেন। এভাবে দেখতে দেখতে একসময় প্রশান্তি সরে যেতে থাকে। দেখতে দেখতে গভীর বিষাদে বুক ভরে যায়, দেখতে দেখতে দুঃখ জরজর বুক। দুহাত বুকের ওপর রেখে তিনি উপুড় হয়ে বালিশে মুখ ডুবিয়ে দেন। বুক থেকে কি যেন কণ্ঠে ঠেলে উঠতে চায় কান্নার মতো।এভাবে অনেকক্ষণ কেটে যায়, আস্তে আস্তে সারা বাড়ি জেগে ওঠে। সকলের কথাবার্তা ব্যস্ততা শোনা যায় বোঝা যায়। কেউ বা তার বন্ধ দরজার ওপারে আলতো ডাক দিয়ে চলে যায়, তখন তিনি ওঠেন, বিছানা থেকে নামেন, শরীর যেন বিষ। তিনি দরজা খু লে দিয়ে ফিরে আসেন, বারান্দায় চলে যান, সেখানে বেতের চেয়ারে এলিয়ে পড়েন, নিঝুম বসে থাকেন, সকালের শান্ত বাতাসে শুধু তাঁর কাঁচাপাকা বিরল চুলগুলি অল্প অল্প কাঁপে।

এটা দক্ষিনের বারান্দা। এটা তাঁর একদার কল্পনার সুখ। যখন এই বাড়ি হয়নি, যখন তিনি মধ্য কলকাতার সরু এক গলির ভাড়াটে বাসিন্দা ছিলেন, যে ঘর দুটিতে প্রায় সারাদিনেও আলো জ্বাললে ভাল হতো তখন সেই বদ্ধ ঘরে শুয়ে শুয়ে কল্পনায় দেখতেন এমনই এক ঝুলবারান্দার ছবি - দক্ষিণের দিকে বুক মেলে আছে, খোলা আকাশের আলো অবাধ বাতাসের উচ্ছাস....

সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে তাঁর জন্ম। সেই বদ্ধপ্রায় ঘরে কেটেছে তাঁর শৈশব কৈশোর যৌবন এবং...

সেই অন্ধবন্ধ ঘরে তাঁর শিক্ষা...চাকুরি...বিবাহ...সংসার...

সেই বাল্যকাল থেকে তাঁর বড় সবুজের প্রীতি, আর আকাশের, আর

অবাধ বাতাসের...

সেই ঘনবসতি যার মধ্যে শুধু সরু সরু গলিপথ আর বাড়ি, বাড়ি আর বাড়ির দেওয়াল আর দেওয়াল তার মধ্যে বৃক্ষলতা গুল্মাদির কোনো চিহ্ন নেই, সেখানে জন্মানো যে শিশু সে বাল্যকাল থেকে সবুজের জন্য বড় তৃষিত। সেই বাড়িতে একটা ছাদ ছিল। একতলায় তাঁদের বাসা, দোতলায় বাড়ির মালিক, তার ওপর ছাদ। যদিও ছাদে যাওয়ার ব্যাপারে কিছু বিধিনিষেধ ছিল তবু সেই বালকের কাছে ছাদ ছিল যেন মহাশূণ্যের অন্তহীন মুক্তি।

সেই ছাদ থেকে চারপাশে শুধু বাড়ির জটলা। তবু মাথার অনেক উপরে নীল আকাশ আছে দেখা যায় এবং দূরে দূরে কিছু কিছু সবুজ গাছপালা ও বাতাসের আন্দোলন...

সেই ছাদে কিছু ভাঙা বালতি, ক্যানেস্তারা, হাঁড়ি ইত্যাদি - কি নয়! তার মধ্যে মাটি - মাটি জোগাড় করতে সে যে কত পরিশ্রম - সেই মাটিতে কিছু রুগ্ন গাছপালা, কচিৎ কখনো অতি কষ্টে ফোটা দু-একটি জীর্ণ ফুল... বিদ্যালয়ের মালী কিংবা সহপাটির কাছ থেকে চেয়ে কিংবা অতি কষ্টে বাঁচানো টিফিনের পয়সা দিয়ে শিয়ালদা স্টেশনের কাছ থেকে হেঁটে হেঁটে কিনে আনা কিছু বীজ রোপন করার মুহূর্ত থেকে রোজ কতবার যে দেখা! সেই ঘুম থেকে উঠেই ছাদে ছুটে যাওয়া থেকে শুরু।

যেদিন মাটি একটু ফাটিয়ে মাথা চাড়া দিতো অঙ্কুর সেদিন কি আনন্দ কি আনন্দ! মাকে বলা বাবাকে বলা, ছোট বোনকে হাজার বার সাবধান করা। - বারবার শুনতে শুনতে মা বিরক্ত, বাবার উপভোগ। তারপর যখন প্রথম কুঁড়ি আবিস্কারের দিন...তারপর একটু একটু করে পাপড়ি মেলে যায়, রঙ ভরে ওঠে....

আজ কয়েকটি গোলাপ ফোটার কথা ছিল, মনে পড়ল, ভোর হয়ে আসছিল, আকাশে আলোর আভাস। আজও সেই বিষন্ন বৃক্ষ বুকের ওপর, তিনি অসহায়, যন্ত্রনায় অস্থির, তারপর ঘুম ভেঙে যায় এবং তিনি শান্ত শুয়ে, সময় তখন রাত্রি, আকাশে সামান্যতম আলোর আভাটুকুও নেই। এভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে যখন ভোর এবং ক্রমশঃ তিনি স্বাভাবিক তখন তাঁর মনে পড়ল আজ কয়েকটি গোলাপ ফোটার দিন।

তিনি আস্তে বিছানা থেকে নামলেন, দরজা খুলে বাইরে এলেন, সারা বাড়ি ঘুমে অচেতন, সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন তারপরে দরজা খুলে ছাদে।

তাঁর নিজের বাড়ি। তাঁর সাধের বাড়ি। তাঁর স্বপ্নের বাড়ি। সারা জীবনের সব পাওনা টাকা সবকিছু দিয়ে গড়ে তোলা ঘিঞ্জি শহর থেকে একটু দূরে। এখানে বসন্তে এখনও কৃষ্ণচূড়া লালে লাল।অশত্থ, বট আর দেবদারুদের নব পত্রসাজ!

তাঁর ইচ্ছা ছিল আরও দূরে কোনো গ্রামের নিভৃতে চলে যাওয়ার, শুধু সন্তানদের মুখ চেয়ে - ছেলের চাকুরি, মেয়ের লেখাপড়া...

মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। ছাদের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ছাদে উঠে দাঁড়ালেই তাঁর বুকের মধ্যে কেমন শিরশির করে, সেই বাল্যকালের সমান শিহর...

তাঁর চারপাশে নানান ফুলের গাছেরা নবীন আলোয় ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আজ কয়েয়টি গোলাপ ফোটার কথা - আবার মনে হলো তাঁর - তিনি বাঁদিকে আরেকটু এগিয়ে গেলেন, সেখানে কয়েকটি টবে নানান গোলাপ, একটি টবের কাছে তিনি উবু হয়ে বসলেন, আর ঠিক তখন তাঁর চারপাশে নেমে এলো ঘন আঁধার, মাথার ভেতর ঝিমঝিমে শব্দ - যেন হাজার ঝিঁঝিঁ পোকার ঐক্যতান। তিনি মুখ তুলে আলোকিত আকাশ দেখতে চাইলেন কিন্তু মনে হলো বিশাল এক বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা পত্ররাশি নিয়ে নিবিড়

সারা আকাশ। ঢেকে ঝুঁকে আছে। তিনি সন্ত্রস্ত....স্বপ্নের সেই বৃক্ষ...
তিনি দুহাতে ভূমি আঁকড়ে ধরতে চাইলেন...

অথচ এই দৃশ্য তাঁর অতি প্রিয় দৃশ্য। বিশাল কোনো বৃক্ষের নীচে দুদণ্ড দাঁড়ানো তাঁর কাছে সৌভাগ্যের ব্যাপার। কোনো বৃক্ষের নীচ দিয়ে পথ অতিক্রম করলে তিনি কয়েকটি মুহূর্তের জন্যও উর্দ্ধমুখে তাকান। ভারী অপরূপ লাগে! বিস্তারিত শাখাপ্রশাখা - পত্ররাশি - আলোর জাফরি আকাশের কুচি কি রহস্যময় সুন্দর.. কিন্তু আজ এই শূণ্য আকাশের নীচে ছাদের ওপর বসে তিনি যখন মাথার ওপর বিস্তারিত দেখলেন স্বপ্নের সেই বিশাল বৃক্ষ - তিনি ভীত সন্ত্রস্ত। তিনি দুহাতে ভূমি আঁকড়ে ধরতে চাইলেন, তাঁর সামনে গোলাপের ডালে সদ্যফোটা ফুলের ওপর তাঁর মুখ ঢুবে যেতে চাইল, মূর্চ্ছিত হয়ে যেতে যেতে তিনি স্বপ্নের সেই বৃক্ষকে চিনতে পারলেন - সেই শিরীষ বৃক্ষ - যাকে তিনি একদিনের জন্য জীবিত দেখেছিলেন, প্রগাঢ় প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। মূর্চ্ছিত হয়ে যেতে যেতে তিনি অস্ফুটে বললেন - সরমা, আমি চিনতে পেরেছি...

ডাঁর এই স্বপ্নের কথা একমাত্র জানতেন তাঁর স্ত্রী সরমা। তখন তাঁরা সপরিবারে এই বাড়িতে চলে এয়েছেন, তখন কিছুদিন হলো ছেলের বিয়ে হয়েছে, তখন গভীর উৎসাহে তিনি বাড়িতে বাগান সাজাচ্ছেন। অবসর জীবন, তাছাড়া সংসারের দায়ীত্ব বা ভাবনা তাঁর নেই। ছেলে শিক্ষান্তে ভাল চাকুরি করছে, বিয়ে হয়েছে, মেয়ে কলেজে পড়ছে, তারও বিয়ের ব্যবস্থা হয়েই আছে, সুতরাং...

তাঁর স্ত্রী কখনো তাঁকে নিরুৎসাহ করেননি। বরং তাঁর মনেও কোথাও বুঝি একই প্রকার তৃষ্ণা ছিল। তিনি গ্রামের মেয়ে, প্রকৃতির নিবিড় বুক থেকে তাঁকে তুলে আনা হয়েছিল শহরের অন্ধ গলিতে তাই তাঁর বুকেও

সেই বৃন্ত-ছেঁড়া ব্যথা কিছু ছিল।

এই নতুন জায়গায় নতুন বাড়িতে তিনিও হাঁফ ছেড়েছিলেন। বাগান করার ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তাঁরও উৎসাহ প্রচুর। বস্তুতঃ নীচ থেকে দোতলার ছাদে বালতি বালতি জল তোলার অধিকাংশ পরিশ্রম তাঁর ভাগেই ছিল। তখনো পাম্প বসানো হয়ে ওঠেনি...

একদিন বিকালে গাছগাছালির মাথার ওপর দিয়ে সূর্য যখন অস্ত যাচ্ছিল, যখন আকাশে আশ্চর্য সব উজ্জ্বল রঙের দুরন্ত প্রলেপ, পাখিরা সারি বেঁধে কোথায় যেন ফিরে যাচ্ছিল তখন ছাদের রেলিঙে ভর দিয়ে তিনি অন্যমনস্ক ভাবে অনেকক্ষণ এসব দেখছিলেন, সরমা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল - কি ব্যাপার বলতো? আজ সারাদিন ধরে তোমাকে অন্যমনস্ক দেখছি? তিনি চমকে উঠেছিলেন, কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আস্তে আস্তে বলেছিলেন - তোমাকে কদিনই বলব বলব ভেবেছি, আমি মাঝে মাঝে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখি - এক বিশাল বৃক্ষ - বিষন্ন যেন - আমার বুকের ওপর, বেড়ে ওঠে - বলতে বলতে তিনি শিহরিত হয়েছিলেন, সরমার হাত আঁকড়ে ধরে বলেছিলেন - কিন্তু সেই গাছটিকে আমি ঠিক চিনতে পারিনা, মনে হয় কোথায় দেখেছি, কোথায়...

আজ সরমা নেই। প্রায় ছমাস হয়ে গেল। এখন তিনি একা। তাঁর সময় এখন বড় শূন্য। এদিকে শূন্যতা ওদিকে সন্ত্রাস। ক্বচিৎ কখনোর সেই স্বপ্ন এখন প্রত্যহের সঙ্গী।

তাঁর যখন জ্ঞান ফিরল চোখ মেলে প্রথমেই দেখলেন ওপরে ঘূর্ণায়মান পাখা, তারপর এপাশ ওপাশ তাকিয়ে দেখলেন কয়েকটি উৎকণ্ঠিত মুখ - ছেলে বৌমা মেয়ে এবং ডাক্তর। ক্লান্তি লাগছিল, তিনি চোখ বুজিয়ে নিলেন।

- মা মারা যাবার পর থেকে বাবা কেমন হয়ে গেছেন ডাক্তারবাবু - ফিসফিস করে ছেলে বলল।

- খুবই স্বাভাবিক - বললেন ডাক্তারবাবু - মানসিক চাপে শরীর দুর্বল, খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রাম দরকার, আর দেখবেন, সকালে উঠেই ছাদে না যান। যদি যান অন্ততঃ কিছু খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে তারপর।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

মেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, খুব শান্তি লাগছিল তাঁর।

- বাবা, এই দুধটুকু খেয়ে নিন - বৌমা বলল। তিনি উঠলেন, দুধটুকু খেলেন, খুব দুর্বল লাগছিল, শুয়ে চোখ বুজলেন।

.... আমি চিনেছি - তিনি মনে মনে বললেন - স্বপ্নের সেই বৃক্ষকে আমি চিনতে পেরেছি...

আজ কয়েকটি গোলাপ ফোটার কথা ছিল। গোলাপেরা কথা রেখেছে। কিন্তু আমি সম্ভবতঃ গোলাপের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম। হয়ত গাছটি ভেঙে গিয়েছে। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম... আমার শরীর টা কিছুদিন ধরেই খুব দুর্বল হয়েছে। পরপর কতগুলি রাত আমি ভালো করে ঘুমাইনি। প্রায় ছমাস হয়ে গেল সরমা চলে গেছে তারপর থেকে এই ভীষণ স্বপ্ন আমাকে আরও পীড়ন করে। যখন সরমা ছিল হাত বাড়ালে তাকে পাওয়া যেত, তখন অনেক ভরসা পেতাম, বল পেতাম, কিন্তু এখন...আমার মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। গোলাপদের দেখছিলাম...

... কে আমাকে তুলে আনল? কাউকে জিজ্ঞেস করব? সবাই চলে গেছে... ফাঁকা ঘর...ভেবেছে আমি ঘুনিয়ে পড়েছি।

....এতদিনে আমি স্বপ্নের সেই বৃক্ষকে চিনতে পারলাম। কি আশ্চর্য আমি কি করে ভুলেছিলাম! হয়ত ভুলতে চেয়েছিলাম, জোর করে ভুলতে চেয়েছিলাম? হয়তোবা...সেইদিন - যেদিন আমি প্রথম ওকে দেখেছিলাম...

সেদিনের কথা তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে চাইলেন। খুবই আশ্চর্যভাবে

প্রতিটি খুঁটিনাটি তাঁর বন্ধ চোখে ভেসে উঠছিল।

বাড়ি তৈরির ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ প্রচুর। অবসর নেওয়ার পর যখন পাওনা টাকাকড়ি পেয়ে তিনি তাঁর মনোগত ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার কথা বললেন তখন ছেলে খুবই উৎসাহে জমি খুঁজতে লেগে গেল। ওর মা বললেন - আগে তোর বিয়েটা হোক, তা ছেলে বলে - না, আগে বাড়ি হোক তারপর।

তারপর ছেলে একদিন জানালো অনেক জমি দেখে দেখে একটি খুব পছন্দসই পাওয়া গেছে। অতএব রবিবার রোদ ঝলমল বিকালে ছেলের সঙ্গে তিনি জমি দেখতে গেলেন।

দিনটি ছিল ভারী সুন্দর! মনে তাঁর শান্ত আনন্দ ছলছল করছিল। যখন তিনি পৌঁছলেন আর ছেলে তাঁকে দেখাল তখন তাঁর এরকম মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনো নবআবিস্কৃত রূপকথার রাজ্য দেখছেন। জমিটির এক কোনে এক বিশাল শিরীষ গাছ পাহাড়ের মতো গম্ভীর দাঁড়িয়ে। ঈষৎ ঝুঁকেছিল গাছটি, যেন সেই খোলা জমিটুকু তার স্নেহের ধন এবং সেটুকু সে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বুকের ছায়ায় ঢেকে রেখেছে। সেই বিশাল বৃক্ষের বয়স কত কে জানে! তিনি অবাক হয়ে দেখছিলেন, ঊর্দ্ধমুখে দেখছিলেন। তখন বিকেলের শেষ রোদ গায়ে মেখে আছে বৃক্ষ এবং তার শাখাপ্রশাখায় অজস্র ঘরে ফেরা পাখি কলরব করছে। সে এক অনুভব! পাখিদের কণ্ঠস্বরকে পাশাপাশি রেখে সেখানে কলরব করছিল আরও অনেকজন - কতগুলি শিশু। তারা সেখানে খেলা করছিল। তারা সেখানে ছুটোছুটি করছিল। এক সময় তিনি রাস্তা থেকে নেমে পায়ে পায়ে জমিতে নেমে পড়লেন, বৃক্ষের কাছে

গেলেন, তিনি ঊর্দ্ধমুখে বৃক্ষকে দেখছিলেন। বৃক্ষ যেন তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে। তার বিস্তারিত শরীর যেন সমস্ত আকাশ ঢেকেছে। মাঝে মাঝে আলোর জাফরি, আকাশের কুচি। তিনি অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর অস্ফুটে বললেন - সুন্দর, খুব সুন্দর!

কিন্তু বাড়ি ফিরতে ফিরতে একটি কথা তাঁর মনে এলো, ছেলেকে বললেন - হ্যাঁরে, এখানে বাড়ি হবে কি করে? গাছটা তো জমির তিনভাগই ঢেকে রেখেছে।

- কেন? গাছটাতো এক কোণে - ছেলে বলল।

- হ্যাঁ, কোনে বটে, কিন্তু কেমন ঝুঁকে পড়ে জায়গাটা ঢেকে রেখেছে, তাই না?

- তাতে কি আছে, গাছটা তো কেটেই ফেলা হবে।

- না না - তিনি সন্ত্রস্ত - অতবড় গাছ, কি সুন্দর! কতদিনের গাছ কে জানে!

- তিনি তীব্র প্রতিবাদ করলেন।

- জমিটা খুব সুন্দর ছিল - ছেলে খুঁত খুঁত করতে করতে আবার জমি খুঁজতে লাগল।

কিছুদিন পর ছেলে কিন্তু বলল - দেখো বাবা, সেই জমির মালিক নিজেই গাছটা কেটে বিক্রি করে দিয়েছে। অতবড় একটা গাছের দাম তো কম নয়! এখন জমিটা ফাঁকা। দেখো, ভাল জমিটা হাতছাড়া করে ফেলব? জায়গাটা খুবই সুন্দর, খোলামেলা পরিবেশ, যেরকম তুমি পছন্দ করো ঠিক সেরকম।

গাছটা নেই! আহা অমন সুন্দর! - বুকে তীব্র ব্যাথা লাগল তাঁর। কোনো কথা বলতে পারলেন না।

ছেলে মাকে বলল - মা, বাবার মত আছে।

- ঠিক আছে ঠিক আছে, তুই ব্যবস্থা কর - মা বললেন।

- তোমাদের কিচ্ছু ভাবতে হবেনা, দেখোনা কেমন সুন্দর বাড়ি করি, আমার এক বন্ধু আছে 'আর্কিটেক্ট' - মানে সুন্দর সুন্দর বাড়ি বানানোর ইঞ্জিনিয়ার।

....এই নিঝুম রাতে ও কিসের শব্দ? বাতাস কি জোরে বইছে? এ তো গাছের শাখায় শাখায় হিল্লোলের শব্দ! আমার ঘুম আসছে না...আমার কি জ্বর হয়েছে? না হলে সারা গায়ে এমন আগুন ছুটছে কেন? আর এতো ক্লান্তি! চোখের পাতা খুলতেও কষ্ট লাগছে... আজ কয়েকটি গোলাপ ফোটার কথা ছিল, গোলাপেরা কথা রেখেছে... কিন্তু আমি বোধহয় গাছটিকে ভেঙে ফেলেছি...আমি উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল...আমি সেই বিশাল বৃক্ষকে গভীর বিষন্নতায় ঝুঁকে পড়তে দেখেছিলাম আমার বুকের ওপর...

... এখন রাত কত? বৌমা যখন খাবার খাইয়ে গেল তখন বলেছিল দশটা, তাহলে এখন কি মধ্যরাত?... রাত...রাত এলেই স্বপ্ন... সেই বিশাল বৃক্ষ....আহা! কি সুন্দর, কি গভীর, কি মহিয়ান! আমি সেই বৃক্ষকে নিহত করেছি। বৃক্ষেরা প্রতিবাদ করেনা, আর্তনাদ করেনা, অথচ যন্ত্রণা পায়। যন্ত্রণা পেতে পেতে নিঃশব্দে মরে যায়। এমনই একটি প্রাণকে নিহত করেছি। এখন সেই বৃক্ষের আত্মা দুঃখ নিয়ে কষ্ট নিয়ে যন্ত্রণা নিয়ে আমার কাছে বেদনা জানায়। প্রতিবাদ নয়, ক্ষোভ নয়, তিরস্কার নয়, শুধু নিরব বেদনা... আহা, কি বিষন্ন মূর্তি তার...কি করুণ!... আমি নাকি বৃক্ষদের ভালবাসি। সেই বাল্যকাল থেকে আমি - কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো হে মহীয়ান তুমি বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম। তোমাকে দেখে আমি মুগ্ধ, আমি বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ, শুধু মনে হয়েছিল কি সুন্দর, আহা কি সুন্দর...

... কি অপরূপ জোৎস্না আজ। আমি এতক্ষণ চোখ বুজে ছিলাম। আমি এখন বাইরে যাবো। আজ আমি তাকে ভাল করে দেখব। আমার চেনাকে। এতদিন অপরিচিতকে দেখতাম - ভয় পেতাম - আজ আমার ভয় নেই...

... কি সুন্দর জোৎস্ন! এমন জোৎস্নায় গাছেরা ঘুমায় না, সারা গায়ে জোৎস্না মেখে বাতাসের সাথে খেলা করে....

.... না, সে নেই। কি বিশাল শূন্যতা! আজ রাতে তার জোৎস্নার সাথে খেলা করার কথা ছিল, কিন্তু আমি তাকে নিহত করেছি। ওইখানে, ওইখানে সে ছিল। ওই তার মৃতদেহের কিছু চিহ্ন এখনও পড়ে...আঃ...

কিছু ঝোপঝাড় অসংলগ্ন ভাবে মাড়াতে মাড়াতে তিনি এগিয়ে গেলেন সেখানে যেখানে কেটে ফেলা গাছটির মাটিতে থাকা অংশটুকু বড় একটা বেদীর মতো পড়েছিল।

তিনি আলতো ভাবে সেখানে হাত ছোঁয়ালেন। তাঁর বুকের মধ্যে গভীর যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল, তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না, সেই রুক্ষ কর্কশ মৃত বৃক্ষের দেহাবশেষের ওপর শুয়ে পড়লেন।

তাঁর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল, চোখের পাতা খুলতে কষ্ট হচ্ছিল, অথচ বাতাসে বৃক্ষ মর্মর ধ্বনি তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি চোখ খুললেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্তে তিনি দেখছিলেন সেই বৃক্ষ ঊর্দ্ধমুখে শাখা-প্রশাখা পত্ররাজি বিস্তার করে অবাধ বাতাসে আন্দোলিত.... তিনি দেখছিলেন তাঁকে গভীরে টেনে নিয়ে বৃক্ষের শরীর ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে উঠেছে।